মৃতের কথোপকথন

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

র্য্য পাব্‌লিশিং হাউস,
জ ষ্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা।

সূচী

১

শিবাজী, জয়সিংহ

জয়সিংহ

দুজনার আমাদের কারোই জয় হয় নি। দেশের উপরে তৃতীয় একটা শক্তি এসে পড়ে, তোমার কর্ম্মের ফল আহরণ করেছে—আর আমার কর্ম্ম, তা ত ভেঙ্গে চুরে গেছে ; যে আদর্শ নিয়ে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম তা এখন ধূলির সাথে মিশে গেছে।

শিবাজী

ফলের জন্য আমি কর্ম্ম করি নি। ব্যর্থতায় তাই আমি স্তম্ভিত নই, হতাশও নই।

জয়সিংহ

আমিও ত নিজের লাভের জন্যে কর্ম্ম করি নি। আমি করেছিলেম রাজপুতের আদর্শকে তুলে ধর্‌তে। ন্যায়যুদ্ধে অটুট সাহস, শত্রুমিত্র নির্ব্বিশেষে মর্য্যাদা-দান, রাজা বলে আমি যাঁকে স্বীকার করে নিয়েছি তাঁর উপর নিষ্ঠা, এই ত ভারতের খাঁটি সনাতন প্রথা। হিন্দু জাতির একত্ব ও প্রভুত্বের যে আদর্শ তার চেয়েও একে আমি বড় মনে করি। তাই তোমার প্রস্তাব আমি গ্রহণ কর্‌তে পারি নি; বরং আমার পথ অনুসরণ করতে তোমায় আমি ডেকে-ছিলাম। কিন্তু যখন দেখ্‌লেম তোমার সাথে যে সত্য করা হয়েছিল, আমারও সাথে যে সত্য করা হয়েছিল তা রক্ষা করা হোল না, তখন তোমার পলায়নে সাহায্য করে আমি আমার আত্মসম্মানকে বাঁচাতে চেষ্টা কর্‌লেম।

শিবাজী

ভগবান তাঁর অভয় হস্ত আমার উপর প্রসারিত করে দিয়েছিলেন, তাই একটি নারীর হৃদয় ব্যথিত হয়ে উঠলো ; সে এসে আমায় ভালবাসা দিলে, সাহায্য দিলে। প্রথার পরিবর্ত্তন হয়। রাজপুতের আদর্শ ভবিষ্যতে কাজে আসবে, কিন্তু এর কাঠামটি ভেঙ্গে ফেলতে হবে, এর ভিতর যা কেবল সাময়িক সেটা যাতে দূর হয়ে যায়। আমি যাঁকে রাজা বলে স্বীকার করে নিয়েছি তাঁর উপর নিষ্ঠা, ভাল কথা ; কিন্তু আরও ভাল আমার দেশ যাঁকে রাজা বলে স্বীকার করে নিয়েছে তাঁর উপর নিষ্ঠা। রাজা দেবতা, কিন্তু ভগবানের যে শক্তি তাঁর মধ্যে ফুটে উঠেছে তারই বলে। রাজা এই শক্তি ধারণ করেন, যখন প্রকৃতিপুঞ্জ তাঁকে স্বেচ্ছায় বরণ করে নেয়। দেশের অন্তরে যে ভগবান, তিনিই ইষ্ট ; রাজা

তাঁর সেবক মাত্র। বিঠোবা, মারাঠার বিরাট প্রাণরূপিনী ভবানী, এঁদের শক্তিতে আমি বিজয়ী হয়েছি !

জয়সিংহ

তোমার রাষ্ট্রের আদর্শ খুব মহৎ, কিন্তু উপায় তোমার যে ধরণের তা আমাদের সকল নীতি ধর্ম্মের মূলচ্ছেদকারী। চাতুরী, বিশ্বাসঘাতকতা, লুঠ, খুন—এ সব ত তোমার কাজের বাইরে ছিল না।

শিবাজী

আমি ভগবানের জন্য, মহারাষ্ট্র ধর্ম্মের জন্য, রামদাস যে ধর্ম্ম দিয়েছিলেন সেই হিন্দুরাষ্ট্রের ধর্ম্মের জন্য অসি ধরে ছিলেম, শাসন দণ্ড ধরেছিলেম—নিজের জন্য নয়। আমি আমার মস্তক ভবানীর কাছে উৎসর্গ করে দিই। মা তা আমাকেই

রাখতে বল্‌লেন, তা দিয়ে জাতির কল্যাণের জন্যে মন্ত্রণা কর্‌তে, কৌশল উদ্ভাবন কর্‌তে। আমার রাজ্য আমি রামদাসকে দিয়ে দিই, তিনি ভগবানের, মারাঠার দানরূপে তা আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। এই দুই আদেশই আমি পালন করেছি। আমি হত্যা করেছি ভগবানের আজ্ঞায়। আমি লুঠ করেছি যখন ঐটিকেই উপায় বলে তিনি দেখিয়ে দিয়ে-ছিলেন। বিশ্বাসঘাতক আমি কখনও ছিলাম না। কিন্তু লোকসংখ্যা ও উপকরণের অভাব আমায় মিটিয়ে নিতে হয়েছে—ছলের ও কৌশলের সহায়ে; শারীরিক বলকে আমি হটিয়েছি বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা মস্তিষ্কের জোর দিয়ে। যুদ্ধে ও রাষ্ট্রনীতিতে ছলের স্থান জগৎ স্বীকার করে নিয়েছে। রাজপুতের সম্মুখ-যুদ্ধ ঔদার্য্যের চিহ্ন সন্দেহ নেই, কিন্তু পাশ্চাত্যের কি প্রাচ্যের কোন জাতিই তা মেনে চলে নি।

জয়সিংহ

আমি ধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ বস্তু বলে জান্‌তেম। তাই ভগবানের আদেশ পর্য্যন্ত তা হ'তে আমাকে বিচ্যুত কর্‌তে পার্‌ত না।

শিবাজী

আমি আমার সবই ভগবানকে দিয়ে দিয়েছিলেম। ধর্ম্মকে পর্য্যন্ত রাখি নি। তাঁর ইচ্ছাই আমার ধর্ম্ম। তিনি আমার সেনানী, আমি তাঁর অধীনে সৈনিক মাত্র। আমার নিষ্ঠা এইখানে। ঔরঙ্গজেবের উপর নয়, কোন নীতি-শাস্ত্রের উপর নয়, আমার নিষ্ঠা যে ভগবান আমাকে এ মর্ত্ত্যলোকে পাঠিয়েছেন তাঁর উপরে।

জয়সিংহ

ভগবান আমাদের সবাইকেই পাঠিয়েছেন, তবে

ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যের জন্য। আর সে উদ্দেশ্যের মত করেই তিনি প্রত্যেকের আদর্শকে স্বভাবকে গড়েন। মোগলের পতনে আমি দুঃখ করিনা। নিজের প্রভুত্ব বজায় রাখবার যোগ্যতা তার যদি থাকত, তবে সে বস্তু কখনই সে হারাত না। কিন্তু অযোগ্য হয়ে পড়লেও, আমার প্রতিশ্রুতি, আমার নিষ্ঠা আমার সেবাকে অটুট রেখেছি। আমার সম্রাটের অনুজ্ঞার সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক তোলা আমার কাজ নয়। ভগবান তাঁকে মনোনীত করেছেন, তিনিই তাঁর বিচার কর্‌তে পারেন; আমার কর্ত্তব্য তা নয়।

শিবাজী

যে মানুষ মাথা তুলে দাঁড়ায়, অন্যায় প্রভুত্বকে মেনে নিয়ে তার আয়ু বাড়িয়ে দিতে চায় না তাকেও ভগবানই মনোনীত করেন। ভগবান সব

সময়েই শক্তিশালীর পক্ষ নেন না, কখন কখনও তিনি পরিত্রাতা হয়ে থাকেন।

জয়সিংহ

তবে তাঁর কথামত তিনি স্বয়ং নেমে আসুন। বিদ্রোহের ন্যায্যতা তবেই প্রতিপন্ন হবে।

শিবাজী

কোথা থেকে তিনি নেমে আস্‌বেন? তিনি যে এইখানেই রয়েছেন, আমাদের অন্তরের মধ্যে। আমি তাঁকে এই এখানে দেখ্‌ছি, তাই ত আমার ব্রত সাধন করবার শক্তি আমি পেয়েছিলেম।

জয়সিংহ

কিন্তু তোমার কাছে তাঁর পাঞ্জা, তাঁর হুকুম-নামা কই?

শিবাজী

একটা সাম্রাজ্যকে আমি টলিয়ে দিয়েছি—আর

তা গড়ে ওঠেনি। একটা জাতিকে আমি সৃষ্টি করেছি, এখনও তা ধ্বংস হয় নি।

২

মাট্‌সীনি, কাভুর, গারিবাল্‌দি

মাট্‌সীনি

আমার বার্ত্তার যে প্রয়োজন ছিল, তার প্রমাণ ইতালির বর্ত্তমান অবস্থা। কাভুরেব পথে মাকিয়াভেল্লির কূট রাজনীতি আবার প্রাণ পেয়েছে, ইতালি অধীর হ'য়ে যত্নের আশুফল আঁকড়ে ধরতে গিয়েছে, তাই আমি যে দিব্যদৃষ্টি তাকে দিয়েছিলেম তা তার মুছে গেছে। তাই, তার দুঃখ ঘোচেনি। ফলের জন্য কাজ ত করতেই হবে—কিন্তু আসক্তি যদি তার উপর এত হয় যে সেটাকে তাড়াতাড়ি ধরতে গিয়ে আসল উপায়টি বিসর্জ্জন দিয়ে ফেলি, তবে শেষে আসল লক্ষ্যটিকেও সেই সাথে বিসর্জ্জন দিতে হয়।

কাভুর

আমার পথ যে নির্ভুল, তার প্রমাণ ইতালির রাষ্ট্র। মাট্‌সীনি, তুমি এখনও ভাবুকের মত, খেয়ালীর মত কথা বলছ। রাষ্ট্রনীতিক আদর্শকে মানেন, কিন্তু খেয়ালের সাথে তাঁর কোন কারবার নেই। তাঁর লক্ষ্য আসল জিনিষটিকে হাত করা, খুঁটিনাটির অনেক তিনি বিসর্জ্জন দিতে পারেন।

মাট্‌সীনি

তুমি যা বলছ তা সত্য; কিন্তু খুঁটিনাটির ত বিসর্জ্জন দেওয়া হয় নাই, আসলেরই বিসর্জ্জন হয়েছে।

কাভুর

ইতালি এক, ইতালি স্বাধীন ;

গারিবাল্‌দি

সে ঐকা আমার কাজ। আমি মাকিয়াভেল্লির কূটনীতি অনুসরণ করি নাই; রাজনীতি বা রাষ্ট্রনীতির চাতুরির উপর আমি নির্ভর করি নাই। দেশের অঙ্গচ্ছেদ করে আমি স্বাধীনতার মূল্য দেই নি। জাতির প্রাণকে চেয়ে আমি ডাক দিলেম, সে প্রাণ জেগে উঠলো, ছোট বড় সব অত্যাচারীকে ঝেড়ে ফেলে দিলে। কাভুরের উচিত ছিল ইতালির অন্তরাত্মার বীর্য্য ও গরিমার উপর নির্ভর করা, ফ্লোরেন্সের নব-অভ্যুত্থান, রোমের ও নেপ্‌লেসের অতীত স্মৃতির উপর নির্ভর করা। তা না করে, তিনি নির্ভর করলেন ক্ষুদ্রচেতা নেপোলিয়নের মত ক্ষুদে রাজ্যের পসারীর উপর।

মাট্‌সীনি

ইতালি এক, ইতালি স্বাধীন—দেহে, প্রাণে

নয়। গারিবাল্‌দি, ইতালিকে এক ক'রে তুমি একজন মানুষের হাতে তুলে দিয়েছ, দেশের লোককে দাও নি।

গারিবাল্‌দি

রাজাকে, বীরকে, ইতালির প্রতিনিধিকে আমি দিয়েছি। খারাপ কাজ করেছি বলে আমি তা মনে করি না। দেশ বল্‌লে, "আমার হয়ে দাঁড়িয়ে ঐ লোক"—আমি দেশের বাণী মাথা পেতে নিলেম।

কাভুর

জীবনের ঐ তোমার শ্রেষ্ঠ কাজ। সব সমস্যা পূরণ হয় নি, জাতির অঙ্গে কোথাও কোথাও এখনও দুঃস্থতা রয়ে গেছে—কিন্তু সে ত স্বাভাবিক। বসে বসে স্বপ্ন যে দেখে সেই চায় এমন সুদীর্ঘ এমন ক্ষয়কর রোগ হ'তে এক মুহূর্ত্তে নিরাময় হয়ে

যেতে। আমরা করেছি অস্ত্র প্রয়োগ, এখন ঔষধের ব্যবস্থা ধীরে ধীরে বিনা আড়ম্বরে ক্রমে হচ্ছে। ইতালিতে একজন মানুষের দরকার হয়েছিল, তাকে পেয়ে সে বরণ করে নিয়েছে।

মাট্‌সীনি

কিন্তু ইতালি তার ব্রত পূর্ণ করতে পারে নাই। তার দিকে তাকালে দুঃখে আমার বুক ভরে যায়। যাকে আমি শিক্ষা দিলেম জগতের নেতা হয়ে চলতে, সে কিনা আজ একটি নগণ্য রাষ্ট্রশক্তি, স্বার্থপর কুটিল টিউটনশক্তিকে ভর করে তবে তাকে দাঁড়াতে হচ্ছে। যার কাজ ছিল মুক্তির যুগের নতুন ভাবের নতুন ছাঁচে শাসনযন্ত্রকে সমাজকে ঢেলে গড়ে তোলা, সে কিনা সবার পিছনে পড়ে রইল, 'গলে'র সাক্‌সনে'র পদানুসরণ করতে লাগ্‌ল। ইউরোপের অভিনব দীক্ষার উৎস যে

হ'ত, তাকে শিক্ষায় যারা মানবজাতির অগ্রণী, তাদের মধ্যে ত দেখ্‌তে পাচ্ছি না। এশিয়াবাসীর মত বর্ব্বর রুশও মানব জাতির জন্যে যা করছে, রোমকের উত্তরাধিকারীরা তাও পারছে না।

কাভুর

রাজনীতিজ্ঞের ধৈর্য্য চাই, প্রত্যেক ধাপ ঠিক করে নিয়ে লক্ষ্যের দিকে ধীরভাবে শান্তভাবে অগ্রসর হতে হবে। মাট্‌সীনির আদর্শ তখনই কার্য্যে পরিণত হবে যখন ইতালির অর্থকষ্ট দূর হয়ে যাবে, যখন পৌরোহিত্য-ধর্ম্ম উন্নতির পথে আর বাধা দেবে না। ইতালির মস্তিষ্ক, ইতালির তরবারি এখনও ইউরোপকে ধরে চালিয়ে নিতে পারে।

মাট্‌সীনি

চালবাজ যে, সময়ের ফেরে ফেরে চলে যে,

তাকে দিয়ে বৃহৎ সিদ্ধি কখন কিছু হতে পারে না। সময় যার হুকুম মেনে চলে, সুবিধা যে তৈরী করে নেয়, চাই এমনতর বীর হৃদয়, তেজীয়ান মস্তিষ্ক। ইতালিকে আমি বীর-ধর্ম্মে দীক্ষিত কর্‌তে চেয়েছিলেম। আমি জান্‌তেম ইউরোপ তৃতীয় বারের জন্য নব জীবন পেতে যাচ্ছে, আর ইতালিই হবে সে কাজের পথ প্রদর্শক। আমি যখন পিতৃপুরুষদের লোক হতে পৃথিবীতে মানবদেহ ধারণ করতে যাব, তখন আমাকে এই কথা বলে পাঠান হয়েছিল "ইতালি দুইবার ইউরোপকে নতুন দীক্ষা দিয়াছে, আর একবার সে দেবে"। আমাদের নেমে আসবার সময়কার বাণী কখন নিষ্ফল হয় না।

কাভুর

তা বটে, কিন্তু ফল যে তৎক্ষণাৎ পাওয়া যায় তা নয়। অনেক পরীক্ষার ভিতর দিয়ে চল্‌তে হয়,

আস্তে আস্তে শুদ্ধির আগুনে পুড়ে উঠতে হয়—এমন কি যে জিনিষ অব্যর্থ ভবিতব্য, তাকেও মনে হয় যেন একটা অমূলক স্বপ্ন। সিদ্ধি হবে এই জেনে আমাদের কাজে লেগে যেতে হবে, সে সিদ্ধি বিলম্বিত হলেও অধীর না হয়ে, ক্ষুব্ধ না হয়ে, হতাশ না হয়ে কাজ করেই যেতে হবে। সে সিদ্ধি লাভের সময় হয়ত আমাদের উপরই ডাক পড়বে। ইতালিকে আমরা চিরকাল সাহায্য করে এসেছি, আবার একবার সাহায্য করবো।

মাট্সীনি

তা জানি না—কিন্তু এই আনন্দের লোকেও দিনগুলি আমার যেন ভারি হয়ে উঠছে। সে ডাক যখন আবার আসে তখন যেন আমরা বিজয়ী হই, কূটনীতি দিয়ে নয় কিন্তু সত্যের, সজীব সাহসের জোরে—এই আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা।

গারিবাল্দি

হ্যাঁ, দর দস্তুর করে নয় কিন্তু বীরের তরবারি সহায়ে—

মাট্‌সানি

রাজনীতি দিয়ে নয়, কিন্তু সার্ব্বভৌমিক প্রীতি দিয়ে, মহান্‌ জ্ঞান দিয়ে।

কাভুর

ইতালির জয় হলেই আমি সন্তুষ্ট।

গারিবাল্দি

ইতালির হাত হতে যে তরবারি আবিসীনীয়াবাসীর আঘাতে বিচ্যুত হয়েছিল, সে তরবারি আবার যখন উত্থিত হবে—তাকে তুলে ধরতে আমি উপস্থিত থাকবো।

৩

আকবর, ঔরঙ্গজেব

আকবর

বৎস, আমার উদ্দেশ্যকে বিলম্বিত তুমি করেছ কিন্তু মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পার নি। বরং তোমার পথই যে ভুল তা বোধ হয় আজ স্বীকার করতে রাজী আছ। ভারত ভারতবাসীর, হিন্দুরও নয়, মুসলমানেরও নয়, আর কোন বিশেষ ধর্ম্ম বা জাতিরও নয়—এই গোড়ার সূত্র ঠিক না রেখে চললে কোন শৃঙ্খলা কোন ব্যবস্থাই এ দেশে দু' দিনের বেশী স্থায়ী হবে না।

ঔরঙ্গজেব

আমার আদর্শ সফল হয় নাই। কিন্তু একবার

কি বারবার বিফল হইলেও, আদর্শ যে ভুল হতে বাধ্য এমন যুক্তি ত আমি দেখছি না। আমি বুঝ্‌তে পারি না একটা বিশেষ ধর্ম্ম বিশেষ জাতি ছাড়া কোন দেশ কি করে গড়ে ওঠে। দেশ ত খানিকটা মাটি নয়, একটা চিড়িয়াখানা নয় যে সেখানে রকম বেরকমের জীব জানোয়ার আস্তানা বেঁধে চরে বেড়াবে। দেশের পিছনে চাই একটা প্রাণ, একটা সজীব একত্ব, একটা জাগ্রত আদর্শ। এক জাতি, এক ধর্ম্ম ছাড়া কোথা থেকে আস্‌বে সে প্রাণ, সে একত্ব, সে আদর্শ?

আকবর

তা কেন? দেশ দেশ। তোমার ধর্ম্মবোধ জাতিবোধ বলে যেমন একটা জীবন্ত জিনিষ আছে, তেমনি দেশ-বোধ বলেও ঠিক আর একটা জিনিষ আছে। এই দুটো বোধকে আলাদা করে দেখ্‌তে

হবে। বিশেষতঃ যে দেশে বহু জাতি বহু ধর্ম্ম এসে মিলেছে, সে দেশকে নিছক দেশাত্মবোধেরই উপর গড়তে হবে, ধর্ম্মের বা জাতির গোঁড়ামীর উপর গড়া উচিতও নয়, সম্ভবও নয়।

ঔরঙ্গজেব

ধর্ম্ম থেকে জাতি থেকে আলাদা কাটা ছাঁটা একটা দেশবোধ মনের কল্পনা, দার্শনিক বুদ্ধির চাতুরী ছাড়া আর কিছু নয়। ওটা কৃত্রিম জিনিষ, বাস্তবে ওটাকে পাওয়া যায় না। দেশবোধ মানে কি? এক শিক্ষা দীক্ষায় গঠিত, এক ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত, ভ্রাতৃভাবে মিলিত একটি ভূ-খণ্ডের জনসঙ্ঘ। রক্তের মিল নেই, শিক্ষা দীক্ষার মিল নেই, ধর্ম্মের মিল নেই, আদর্শের জীবনের মিল নেই অথচ এক জায়গায় আছি বলেই ভাই ভাই, এমনতর ভ্রাতৃত্ব বন্ধন যে খুব শক্ত বা উঁচু ধরণের,

তা আমি মনে করি না, আর তা কখন হয় কি না তাও জানি না।

আকবর

আচ্ছা, চেয়ে দেখ আজকালকার জগৎ। দেখ, সুইট্‌জারল্যাণ্ড। তিন তিনটে জাত সেখানে —ফরাসী, জর্ম্মণ, ইতালীয়। দুটো বড় বড় ধর্ম্ম— কাথলিক ও প্রোটেষ্টাণ্ট। তারপর দেখ আয়র্লণ্ড, সেখানেও জাতে ধর্ম্মে দুটো ভাগ—অলষ্টর ও দক্ষিণী গেলিক। তবে আয়র্লণ্ড এখনও গড়ে উঠবার পথে, তাই সেখানে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ দেখা দিচ্ছে—কিন্তু ঐ দুভাগের একটা রফা বা মিলন হতে বেশী দেরী হবে না। তারপর দেখ কানাডা—সেখানে আধা ইংরেজ আধা ফরাসী। আরও দেখ বেলজিয়ম—তার এক অর্দ্ধেক ফরাসী ভাবের ফরাসী শিক্ষা দীক্ষায় অনু-প্রাণিত, আর অর্দ্ধেক জর্ম্মণীর প্রভাবে প্রভাবান্বিত।

ঔরঙ্গজেব

এ সব উদাহরণই অধম শ্রেণীর দেশের কথা। নানা ধরণ-ধারণের মধ্যে রফা করে গোঁজা মিল দিয়ে, তাদের সবার ধার নষ্ট করে দিয়ে একটা পঙ্গু ক্ষীণপ্রাণ, কোন রকমে জীবন ধারণোপযোগী দেশ গড়ে তুল্‌তে পার্‌লেও পারা যায় হয়ত ; কিন্তু তেজীয়ান সৃষ্টিক্ষম দেশ পেতে হলে চাই সংহতি, সমভাবুকতা, সর্ব্ব বিষয়ে ঐক্য, জীবনের আদর্শ নিয়ে মিল ও তাকেই প্রকাশের প্রয়াস এবং সাধনা। মানুষ জড় পদার্থ নয়, মানুষ হচ্ছে সজীব গোটা জিনিষ, তার এক ভাগ আর এক ভাগের সাথে ওতঃপ্রোতঃ মিলে মিশে রয়েছে। মানুষকে দিয়ে কাজ কর্‌তে হলে তার সব খানি দিয়ে কাজ কর্‌তে হবে। জাতিবোধ ধর্ম্মবোধ সামাজিক জীবন এমন কি ব্যক্তিগত জীবন এ সব বাদ দিয়ে শুধু দেশবোধ

নিয়ে দাঁড়িয়ে অপরের সাথে এক হওয়া, কর্ম্ম করা, আমি আবার বলি, একটা কৃত্রিম কল্পনা। ধর্ম্ম হচ্ছে মানুষের জীবনের গোড়ার কথা, তার অন্তরাত্মার কথা, ধর্ম্ম মানুষের ভিতর বাহির তার সবখানি ঢেকে ছেয়ে তার প্রতিঅঙ্গের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রয়েছে, ধর্ম্মে অনৈক্য অথচ কর্ম্মে ঐক্য, মানুষ এতখানি দার্শনিক প্রকৃতির নয়। তাই আমি জানি, ভারতকে হতে হবে হয় হিন্দু, নয় মুসলমান—ভারত যদি মর্‌তে না চায়। হিন্দু যা দেবার ভারতকে তা দিয়েছে। হিন্দু হচ্ছে অতীতের শক্তি। আমি মুসলমান শক্তি দিয়ে ভারতকে নতুন দীক্ষায় নতুন জীবনে জাগাতে চেয়েছিলেম।

আকবর

তোমার কথাই যদি স্বীকার করে নেই, দেশের লোককে মিল্‌তে হলে মিল্‌তে হবে ধর্ম্মের মধ্যে,

তবে জিজ্ঞাসা করি ধর্ম্ম তুমি কাকে বল ? এ শিক্ষা কি এখনও তুমি পাও নি, ধর্ম্ম নানা, বাহিরের দিক থেকে, মূলতঃ কিন্তু ধর্ম্ম এক, সব ধর্ম্মই সত্য। একই বস্তুকে হিন্দুরা ভগবান বলে, মুসলমানেরা খোদা বলে, খৃষ্টানেরা গড্ বলে। সে এক অজ্ঞানের যুগ ছিল যখন লোকে অর্থ না বুঝে নাম নিয়ে মারামারি করত। ধর্ম্ম হচ্ছে মানুষের সব চেয়ে যেটি বড় আদর্শ, তার শ্রেষ্ঠতম আকাঙ্ক্ষা। খুঁজে তলিয়ে দেখ, দেখ্‌বে দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে ধর্ম্মে ধর্ম্মে যুগে যুগে এই আদর্শ এই আকাঙ্ক্ষা মানুষের প্রায় একই রকম; দেশের কালের ভেদে সে বস্তু খুব বেশী ভিন্ন হয় নি। পার্থক্য যা সেটা অতি সামান্য খুঁটিনাটিতে। এই যেমন আমি কাবাব ভালবাসি, তুমি হয়ত কোপ্তা ভালবাস, এটা হচ্ছে রুচির ধাতের কথা,

তা নিয়ে খুনোখুনি করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়; সেই রকম ধর্ম্মের যে বিশেষ রূপ বা আচার এক এক জনের ভাল লাগে তা তার রুচির ধাতের কথা। ধর্ম্ম যদি থাকে, জীবনের একটা মহৎ আদর্শ নিয়ে যদি আমরা চলি, তবে তার কি নাম দিচ্ছি বা তাকে ঠিক কি ভঙ্গীতে প্রকাশ কর্‌তে যাচ্ছি, সে সম্বন্ধে অনেক খানি উদার হওয়া বিশেষ কঠিন নয় —এটাও কি সেই ধর্ম্মের সেই আদর্শের অঙ্গ নয়? হিন্দুরা গায়ত্রী পাঠ করে, কিন্তু কলমা না পড়লেই যে তারা জাহান্নামে গেল, এটা কি অজ্ঞানতা নয়?

ঔরঙ্গজেব

এ সব হচ্ছে রাজনীতিকের কথা, ধার্ম্মিকের কথা নয়। ধর্ম্মের টান যে বোধ করে নি, খোদার সাক্ষাৎ হুকুম যে কানে শোনে নি তারি মুখ থেকে এমন উদাসীন এমন জলো রক্তের কথা সব

বেরোয়। আমি জানি সত্যের ও রূপের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। আত্মা থেকে দেহ আলাদা থাকতে পারে না, তেমনি ধর্ম্ম থেকে ধর্ম্মের আচারও পৃথক করা যায় না। নামের রূপের মধ্যেও যে ধর্ম্ম দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত নয়, সে ত হাওয়ার জিনিষ—তর্কাতর্কির জিনিষ; প্রাণের জীবনের কর্ম্মের যে ধর্ম্ম তা বিশেষ নামরূপ ছাড়া থাক্‌তে পারে না।

আকবর

তোমার শিক্ষা এখনও শেষ হয় নি। আমার এত বড় সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করে দিয়েও, তুমি বুঝ্‌তে পার নি, কেন তার ধ্বংস হ'ল। আশা করি একদিন বুঝবে যে ভারতবাসী আগে হচ্ছে ভারতবাসী, তার পরে সে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান।

ঔরঙ্গজেব

হাজার বার ব্যর্থ হলেও, আদর্শ হতে আমি

বিচ্যুত হব না। বুঝ্‌বো, ভুল আদর্শে নয়, ভুল হচ্ছে আমার নিজের অক্ষমতায়। আমায় আবার যদি ভারতে পাঠান হয়, তবে আমি আবার ঘোষণা করবো, ভারতবাসী তুমি আগে হও ধার্ম্মিক ও মুসলমান, তারপরে ভারতবাসী।

আকবর

পৃথিবীতে গিয়ে দেখ্‌বে ধর্ম্মের অর্থ কতখানি বদলে গেছে। মানুষের দেখবার ভঙ্গী কত নতুন হয়েছে। ধর্ম্ম হচ্ছে প্রধানতঃ ব্যক্তিগত জীবনের কথা। কিন্তু সমষ্টিগত জীবনের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে দেশবোধ।

৪

মিরাবো, দান্তন, রোবস্‌পিয়ের—নেপোলিয়ন

মিরাবো

যুগান্তরের মাথা এই এখানে। মহাবিপ্লবের প্রথম ঢেউ তুলে দিয়েছে এই কণ্ঠের বাণী। অন্যায়ের অত্যাচারের পীড়ন একটা জাতিকে যখন শুধু শরীরে নয়, মনে প্রাণেও দীন হীন ক'রে ফেলেছে, একটা অর্দ্ধস্ফুট ক্ষোভে ও রোষে মানুষ যখন ভিতরে ভিতরে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে অথচ প্রতীকারের পন্থা দেখ্‌ছে না বা দেখেও সাহস ক'রে সে পথে ঝাঁপিয়ে পড়্‌তে পার্‌ছে না, তখনই এই অগ্রণীপুরুষ নির্ভয়ে তার বুক এগিয়ে দিয়েছে শত্রুর সঙ্গীনের

সম্মুখে, সকলের প্রাণের কথা মন্ত্রের মত উচ্চারণ করেছে—দেশের কর্ত্তা কোন ব্যক্তি নয়, কোন শ্রেণী নয়, দেশের কর্ত্তা দেশ নিজে। এই মুখের এক ফুৎকারে সব সম্মোহন উড়ে গিয়েছে—শতাব্দির পর শতাব্দি ধ'রে যে পাষাণের চাপ দেশের বুকের উপর ক্রমাগতই স্তূপীকৃত হ'য়ে চলেছিল, এই মাথার কেশরের এক দোলনে সব ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছে, এই গলার এক হাঁকে কোথা হ'তে মুক্তির প্লাবন ছুটে বেরিয়েছে।

দান্তন

সে প্লাবন বিপুল মূর্ত্তিমান করে তুলেছে এই দান্তন। দেশকে সাহস তুমি দিয়েছ, মিরাবো, কিন্তু আমি দিয়েছি দুঃসাহস। জিনিষ সুরু করা খুব কঠিন নয়, কিন্তু কঠিন হচ্ছে তাকে বাড়িয়ে চালিয়ে নেওয়া। পাহাড়ের শিখর থেকে একটা

পতনোন্মুখ প্রস্তরস্তূপ হয়ত একটি মাত্র পদাঘাতে নাড়িয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু সেই পাথর অদম্যবেগে সব ভেঙ্গে চুরে ক্রমেই নাম্‌তে থাকে যখন তখন তার সাথে সমান তালে চলা, তাকে আরও জোরে ঠেলে দেওয়া যে সে শক্তির কাজ নয়। দৈত্যকে ডেকে আনা বরং সহজ কিন্তু ডেকে এনে নিত্য তার কাজের খোরাক জোগান, তার ঘাড়ে চেপে আর একটা দৈত্যই হয়ে উঠা—এজন্য চাই অমানুষী তেজ একটা অলৌকিক সামর্থ্য। তুমি স্রষ্টিকর্ত্তা হ'তে পার, মিরাবো, কিন্তু তোমার সৃষ্টি তোমার চেয়ে বড়, তোমাকে ছাড়িয়ে গেছে। নিজের কাজের দিকে তুমি নিজে মুখ তুলে তাকাতে পার নি। যে শক্তিকে তুমি জাগিয়েছিলে, তার সব অর্থ তুমি বোঝ নি, তার কাজ শেষ হওয়া ত দূরের কথা, একটু এগিয়ে যেতে না যেতেই তুমি

তাকে তোমার অহঙ্কারের সীমা দিয়ে বেঁধে দিতে চেয়েছিলে। জনসঙ্ঘের, দেশের নেতা তুমি হ'তে চেয়েছিলে কিন্তু দূরে থেকে, নিজের আভিজাত্যের দেমাক সম্পূর্ণ অটুট রেখে ! দুই কূল কখন রাখা যায় না। সত্যের বন্যায় মিথ্যার বাঁধ তুমি দিতে চেয়েছিলে, পার নি !

মিরাবো

আমি ধ্বংসকে চেয়েছিলেম, কিন্তু গড়নের জন্যে। ভাঙ্গার পথ আমি দেখিয়ে দিয়েছিলেম, কিন্তু সেই সাথে গড়ার প্রণালীও দিতে চেয়েছিলেম। অদম্য প্রাণের আবেগ, হৃদয়ের অন্ধ আকুলতার পিছনে যদি না থাকে স্থির মস্তিষ্ক, নির্ম্মল দৃষ্টি তবে সব পরিশ্রম সব আকাঙ্ক্ষাই ধোঁয়ায় পর্য্যবসিত হয়। অতীতের ধারা দেখে বর্ত্তমানকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে, তার উপরই ভবিষ্যৎকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

মনের একটা খেয়ালের উপর গড়া, সে ত হাওয়ার উপর গড়্তে চেষ্টা করা। অতীতের চেহারা যতই কুশ্রী হোক্ না কেন, তার ভিতর দিয়েই যে একটা সমবেত জীবন-প্রতিভা ফুটে উঠেছে, তাই ক্রোধে আত্মহারা হয়ে আমি তাকে কেটে ছেঁটে ফেলতে চাই নি—তার সত্যটিকে ধ'রে বর্ত্তমানে একটা সজীব রূপ দিয়ে এক মহিমান্বিত ভবিষ্যতের সাথে ফরাসী জাতিকে নিবিড় সামঞ্জস্যের সূত্রে আমি বেঁধে দিতে চেয়েছিলেম। কিন্তু দেশের শিকড় ধরে তুমি টান দিলে। গোড়ার মাটি সব খুঁড়ে তুলে ছড়িয়ে দিলে। অজ্ঞানের, অধৈর্য্যের, আক্রোশের, অন্ধকারের যত সব বিকট বীভৎস শক্তি তাদেকে তুমি একেবারে তলা থেকে ডেকে জাগিয়ে তুল্লে। ভূতের তাণ্ডবনৃত্যে আমি যোগ দিতে চাই নি।

দান্তন

যেমন ব্যাধি তার চাই তেমনি প্রতীকার। যা পুরাতন জীর্ণ দুঃস্থ বিষাক্ত, তাকে শোধরানের চেষ্টা মূর্খতা। পুরাতন বলেই তা রোগের কারণ। সব ভেঙ্গে চুরে ধূলিসাৎ ক'রে দেওয়াই তখন দরকার ছিল—শুধু তাই নয়, সম্ভব হ'লে সারা ফরাসীদেশের দশহাত মাটি খুঁড়ে আটলান্টিকের জলে ফেলে দেওয়াই ছিল তখনকার কাজ। দেশের তলা ধ'রে আমি টান দিয়েছি—তাই যে আমার গর্ব্ব। জাতির প্রাণ-শক্তি যেখানে, সেখানকার মুখ আমি খুলে দিয়েছি—চাই যে আগে প্রাণের জীবনের পরিচয়, বুদ্ধির আলো সজীব প্রাণেই শোভা পায়। গড়নের কথা আমি যে জান্তেম না, তা নয়। কিন্তু তোমার মত জোড়াতালি দিতে আমি চাই নি। আমি চেয়ে-

ছিলেম একেবারে নূতন ক'রে পাকা বনিয়াদ। দেশের প্রাণ যে তাই চেয়েছিল—ইচ্ছা করলেই বা তাকে কে ঠেকিয়ে রাখবে? ঝঞ্ঝার সম্মুখে দাঁড় করাতে চাও তৃণগুচ্ছ? কে হুকুম দেবে, সে এখানে এইটুকু ভাঙবে, ওখানে ঐটুকু বাঁচাবে, এ পাশ দিয়ে ঘুরে ওপাশ দিয়ে যাবে? মহা-বিপ্লবের তোড় চলে আপন পথে, আপন নিয়মে।

রোব্‌সপিয়ের

সে নিয়ম কাজ করেছে এই হাত দিয়ে। প্রলয়ের প্রাণমূর্ত্তি ছিলে তুমি দান্তন, স্বীকার করি। কিন্তু তোমার সে প্রাণও এক জায়গায় গিয়ে ইতস্ততঃ করছিল, ফিরে আসতে চাচ্ছিল। তাই আমায় এগিয়ে দাঁড়াতে হ'ল—নির্ম্মম অকুণ্ঠ অচঞ্চল উদ্যত-দণ্ডের মত। দান্তন নিজেও যখন বলতে আরম্ভ করলে, "আর না, এই পর্য্যন্ত"—

তখন দেশের শক্তি গিলটিনের করাল কৃপাণ-মূর্ত্তি নিয়ে আমারই মধ্যে পূর্ণভাবে আবির্ভূত হ'ল। সে রুদ্রশক্তি বড় ছোট মানে না, দাস্তন—তাই অক্লেশে তোমাকে পর্য্যন্ত সরিয়ে দিলে। যা কর্‌তে হবে তা আধখানা করে রাখা উচিত নয়, তাকে শেষই করতে হবে, সে জন্যে যতদূর যাওয়া দরকার যেতেই হবে। আদর্শের চাই চরম সিদ্ধি —কঠিন ভীষণ ব'লে মাঝ-পথে যে রফার মিট-মাটের জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়, সে সাধক ভ্রষ্ট, পতিত, আদর্শের শত্রু।

দান্তন

হাত যখন হাতের পিছনে যে শক্তি আছে তাকে ছাড়িয়ে যায়, যন্ত্র যখন যন্ত্রীর কর্ত্তা হ'য়ে তাকে চালাতে চায়, তখন যে কি ফল দাঁড়ায় তার মূর্ত্তিমান নিদর্শন, তুমি রোব্‌সপিয়ের। দান্তন

কোনদিন ইতস্ততঃ করে নি, ফিরে আস্‌তে চায় নি। আমি আদর্শকেই চেয়েছিলেম, কিন্তু তুমি আদর্শের জায়গায় উপায়কেই সর্ব্বেসর্ব্বা ক'রে তুল্‌তে চেয়েছিলে। লক্ষ্য অটুট চাই, কিন্তু তার জন্যে ব্যবস্থা সময়ের প্রয়োজনের সাথে পরিবর্ত্তনীয়। তুমিই লক্ষ্যকে ভুলে, একটা বিধানকেই চরম ক'রে নিয়েছিলে। তোমার জড় যন্ত্রে যখন দান্তনের প্রাণের স্পন্দন আর খেল্‌লো না, তখনই তা ভেঙ্গে পড়্‌লো। আমার পরে তুমি কতদিন টি'কে থাক্‌তে পেরেছিলে ?

মিরাবো

হাতের পিছনে প্রাণ, কিন্তু প্রাণেরও পিছনে মাথা। রোব্‌সপীয়ের ত তোমারই অব্যর্থ পরিণতি, দান্তন—তাকে দোষ দাও কেন ? দেশ যেদিন মিরাবোর পথে না চ'লে, চলেছে দান্তনের পথে,

প্রাণশক্তি যেদিন মস্তিষ্কের নির্দ্দেশ ছিঁড়ে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে—সে দিনই আমি দিব্য চক্ষে দেখেছি কি দুর্দ্দশা ফরাসী দেশের ভাগ্যে লেখা রয়েছে। তাই আমি আগে হ'তেই বিদায় নিয়েছি।

দান্তন

দেশের মাথায় নূতন জীবনীশক্তির দরকার ছিল, তাই সেখানে আমি কঠিন অস্ত্র প্রয়োগ করেছি। তোমার পথে না চ'লে, আমার পথে চ'লে ফরাসীদেশ যে নূতন সত্যে দীক্ষিত হয়েছে, তা ভুল নয়—তার প্রমাণ চেয়ে দেখ বর্ত্তমানে।

রোব্‌সপিয়ের

বর্ত্তমান বর্ত্তমান হ'ত না, যদি দান্তন বা মিরাবোর মত রোব্‌সপিয়েরও হাত গুটিয়ে নিতে চাইত।

নেপোলিয়ন

তোমরা সকলেই উপকরণ জোগাড় করে দিয়েছ, তা থেকে একটা নূতন শিক্ষা দীক্ষার, একটা নূতন জীবনের বিপুল সৌধ গ'ড়ে তোলবার জন্যে দরকার হয়েছিল একজন মহাশিল্পী। তোমাদের সমবেত সাধনা সিদ্ধি লাভ করেছে, তোমাদের মহা প্রয়াস পূর্ণ মূর্ত্ত সার্থক হয়েছে এই নেপোলিয়নে।

৫

রাণা কুম্ভ, মীরাবাঈ

রাণা কুম্ভ

মীরা! তুমি আমার প্রেমের গুরু। তোমাকে নমস্কার করতে আজ আমার কোন দ্বিধা নেই।

মীরাবাঈ

সে নমস্কার গ্রহণ করতে আমারও লজ্জা নেই। সে নমস্কার যে আমার নন্দলালার কাছে গিয়ে পৌঁছুচ্চে।

রাণা কুম্ভ

মীরা! তুমি আমার চোখের দৃষ্টি, আমার হৃদয়ের দুয়ার খুলে দিয়েছ। তুমি আমায় বুঝিয়ে

দিয়েছ স্বামী স্ত্রীর প্রকৃত সম্বন্ধ, দেখিয়ে দিয়েছ পুরুষ-নারীর মিলন রহস্য। আজ আমি তাই যথার্থ আনন্দের অধিকারী। আজ আমার গেহ গেহ হয়েছে, আজ আমার দেহ দেহ হয়েছে, আজ আমার সব সন্দেহ টুটেছে।

মীরাবাঈ

রাধানাথের করুণা সে। বাদসাহের রূঢ় কাম-দৃষ্টি যে দিন আমার ছার রূপের উপর পড়েছিল, সে দিন হ'তেই অনুভব করেছি নারীদেহের মূল্য কি। কোথা থেকে কি একটা তীব্র তেজ এসে আমার সব দেহবোধ পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিলে—তারপর কি স্নিগ্ধ কোমল প্রলেপে আমার সবখানি শীতল টল টল করে দিলে। তোমাকে আমি আর আগের চোখে দেখ্‌তে পারলেম না।

রাণা কুম্ভ

পুরুষের পশুর শরীর আমার, তা বুঝ্‌বে কি করে? তোমাকে তাই কত কষ্ট কত যন্ত্রণা দিয়েছি। পুরুষের দাম্ভিকতাকে পুরুষের মর্য্যাদা ব'লে নারীর নারীত্বকে অপমানিত করেছি। সে ভুল আমার তুমি তোমার নারী-হৃদয়ের নিষ্ঠার বলে, অপরূপ প্রেমের আলো ছড়িয়ে ভেঙে দিয়েছ। পুরুষ ও নারীর মিলন দেহে নয়, প্রাণে নয়, মনে নয়, এ জগতে নয়।

মীরাবাঈ

সে মিলন ভগবানের মাঝে। পুরুষ কে, নারী কে? তুমি কে, আমি কে? নন্দলালার মধুর শ্যাম-মূর্ত্তি সর্ব্বত্র সব জিনিষে। তিনি ছাড়া কেউ নাই, আর কিছু নাই। দেহ-ঘেরা এই আমি-টুকুকে আমি মনে করা, চতুর-সেরার কি চাতুরী!

রাণা কুম্ভ

সে চাতুরী আর আমাদের ভোলাতে পারছে না, মীরা। মানুষের ভালবাসা কতটুকু, কতক্ষণের? মানুষের ভালবাসা, সে ত কেবল ক্ষুধা —এতটুকু খেলেই তৃপ্তি হয়ে যায়, আবার অতিরিক্ত খেতে গেলে অজীর্ণ হয়। মানুষের ভালবাসা, সে ত অধিকারের লোভ—দুজনা দুজনাকে পরস্পর গিল্‌তে চেষ্টা করা। কি করুণ ইতিহাস মানুষের ভালবাসার—উত্তেজনা, অবসাদ, ঔদাসীন্য, অতৃপ্তি, বিরোধ—এই ত!

মীরাবাঈ

মানুষ চায় হয়ত একে অপরের মধ্যে ঢে'লে গ'লে মিশে যেতে—কিন্তু জানে না তা কি ক'রে সম্ভব। পুরুষ যত দিন পুরুষ, নারী যতদিন নারী—নিজ নিজ বোধ নিয়ে নিজের নিজের

বোধের মধ্যে আবদ্ধ থেকে এ চেষ্টা করবে তত-দিন তার চেষ্টা সফল হতে পারে না। এ সহজ কথাটা বুঝবে কবে তারা?

রাণা কুম্ভ

আমার ভালবাসাকে তুমি অসীম অনন্ত করে দিয়েছ, মীরা। হৃদয় আমার ভরাট, কোথাও এতটুকু ফাঁক নাই, এতটুকু শূন্যতা নাই। আমাকে তুমি তুলে ধরেছ তোমার গোপীনাথের মধ্যে—আমরা দুজনে তাঁর মধ্যে তাঁর রসের সাগরে এক হয়ে গেছি।

মীরাবাঈ

তাই সব ভালবাসা তাঁকে সমর্পণ করতে হয়, নিজের সব ভুলে তাঁতে ডুবে যেতে হয়। তার-পর তাঁর লীলা তিনিই বুঝবেন।

৬

আলেকসান্দের, পুরু

আলেকসান্দের

আমার প্রথম পরাজয় তোমার হাতে, পুরু। * ইতিহাসে যাই বলুক, গর্ব্বের বশে আমি নিজেও যা বলে থাকি না কেন, আজ সে কথা স্বীকার করছি। সে ভীষণ রাত্রির ছবি আমি এখনও ভুলতে পাচ্ছি নে—সেই তিমির অন্ধকার, ঘোর ঝঞ্ঝাবৃষ্টি, ঘন ঘন বজ্রপাত, শতদ্রুর স্ফীত কল্লোলিত খর স্রোত, হস্তির, অশ্বের, রথের, মানুষের সে প্রলয় সংঘর্ষ আমার মনে এখনও কি একটা কম্পন রেখে

* প্রচলিত ইতিহাস আমি একটু পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়েছি। তবে ইতিহাসের দিক হইতেও ইহার স্বপক্ষে কিছু বলা যায় কি না তাহার বিচার ঐতিহাসিকেরা করিবেন।—লেখক।

গেছে। তারপর অতিকায় হস্তির উপরে তোমার সেই বিপুল কলেবর, তার কাছে অশ্বরাজ বুকেফালের উপরে আলেকসান্দেরকেও সেদিন বোধ হয় ছোটই দেখাচ্ছিল। বর্ব্বরের দেশে এ পরিণামের জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলাম না।

পুরু

তুমি মনে করেছিলে সিন্ধুর পারে সকলেই বুঝি তক্ষশীলার মত নির্জ্জীব সুখপ্রিয়, পথ ছেড়ে দিয়ে দাঁড়াবে, তোমাকে বরণ করে নিয়ে, তোমার চরণে দেশকে উপঢৌকন দিয়ে পরম সৌভাগ্যবান মনে করবে ?

আলেকসান্দের

তা হ'লে যে খারাপই হ'ত, আমি মনে করি নে, পুরু। আলেকসান্দের শুধু অস্ত্র নিয়ে আসে নি, আলেকসান্দের এসেছিল গ্রীসের আলো নিয়ে।

পাশ্চাত্যের প্রতিভা দিয়ে আমি তোমার সমস্ত ভারতকে, সমস্ত পৃথিবীকে এক ক'রে দিতেম, মানবজাতি এক হ'য়ে সমৃদ্ধ হয়ে উঠত। সে আদর্শকে তুমি ব্যাহত করেছ। কিন্তু আজ দেখছ ত সে আদর্শ আমার মিথ্যা ছিল না—তার মধ্যে কি সত্য, কি জীবন ছিল। তুমি আমার দেহকে হটিয়েছ, পুরু, কিন্তু আমার প্রাণকে হটাতে পার নি।

পুরু

সেই দুঃখই ত আমার বুকে শেল হয়ে আছে। ভারতের পাঁজরা কেটে তুমি পথ ক'রে দিয়েছ—তোমাকে হটিয়েও আমি সে পথ বন্ধ করতে পারি নি। সে পথ দিয়ে হুণ, শক, তাতার, মোগল সব ঢুকেছে, এ সোনার দেশকে দেহে প্রাণে মনে ক্ষিণ্ণ অবসন্ন করে ফেলেছে। আজ তার দেখ কি

অবস্থা! বিদেশীর হাত ধ'রে না থাকলে চল্‌তে পারে না। তার ধর্ম্মে কর্ম্মে শিক্ষায় দীক্ষায় জীবনে নিজের কিছুই নেই—সে অপরের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাত্র। ভারত আর আর্য্য জাতি নয়—সে হচ্ছে একটা মুমূর্ষু সঙ্কর জাতি

আলেকসান্দের

আমি ত দেখছি তোমার দেশ যে এতদিন বেঁচে আছে তার কারণ আমি। আমি তার দেহে নূতন রক্ত ভরে দেবার সুরু করেছিলেম, আমি তার মনে বাইরে থেকে নূতন ভাব এনে চারিয়ে দেবার পথ দেখিয়ে দিয়েছিলেম। তোমার বিশুদ্ধ আর্য্যজাতি তোমার বিশুদ্ধ আর্য্যদীক্ষা নিয়ে কবে লোপ পেয়ে যেত, আলেকসান্দের যদি তাকে ধাক্কা দিয়ে না জাগিয়ে তুল্‌ত, পাশ্চাত্যের আলো, জীবন তার দেহে প্রাণে অনুপ্রবেশ না করিয়ে দিত।

পুরু

নবীন পাশ্চাত্যের এ শুধু দাম্ভিকতা, আলেক-সান্দের। তাকিয়ে দেখ সুদূর অতীতে, বিদেশীর বিজাতির বিধর্ম্মীর স্থূল হস্ত যখন আমাদের জীবনের আমাদের শিক্ষা দীক্ষার উপর পড়ে নাই, কি গরীয়ান ছিল এই সভ্যতার আদি জননী ভারত। পরের স্পর্শে এসে যেদিন সে পরমুখী হয়ে স্বধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিয়েছে সেদিন থেকেই নিজের অন্তরাত্মাকে হারিয়ে মৃত্যুর দিকে চলেছে। নিজেকে নিজের স্বধর্ম্মকে স্বাতন্ত্র্যকে যদি বাঁচিয়ে রাখতে পারত, ভয়াবহ পরধর্ম্ম তার অন্তরাত্মার উপর চেপে না পড়ত, তবে দেখ্‌তে আজ ভারতের কি শোভা কি শ্রী কি মহিমা। নিজেকে ভারত বিশুদ্ধ রাখ্‌তে পারে নি, হাজার রকম বাইরের বিষাক্ত প্রভাব এসে তাকে জর্জ্জরিত ক'রে ফেলেছে, তার

যথার্থ স্মৃষ্টির জীবনবিকাশের ক্ষমতাকে পঙ্গু ক'রে ফেলেছে। কোথায় বৈদিক ঋষির ভারত আর কোথায় চেয়ে দেখ ইংরাজের নকল ভারত।

আলেকসান্দের

তোমাদেরও আত্মাভিমান কম নয়, পুরু। বৈদিক ভারতের কথা কি বল্‌ছ? ভারতের এক কোণে কতকগুলি ছোট ছোট গ্রাম বা নগর— ক্ষুদে রাজা, সহজ সরল জীবন ধারা, অপরিপক্ক আদিম সমাজ, মাঝে মাঝে দুচার জনা জ্ঞানী বা তোমরা যাদেকে বল ঋষি। তোমাদের রামায়ণের তোমাদের মহাভারতের যুগেও এর চেয়ে বেশী খুব এগিয়ে তোমরা যাও নি। সমস্ত ভারতকে একরাষ্ট্রের এক শাসনতন্ত্রে বেঁধে দেবার স্বপ্ন কার মাথায় প্রথম জেগেছিল, কে তার ভিত প্রথম গড়েছিল, কার গড়া সে কাটামো এখন ইংরাজের

ব্যবস্থার নীচে মুসলমানের ব্যবস্থার নীচে তলে তলে দেখা যাচ্ছে ? তোমার মনে পড়ে কি সেই বালকের কথা—যার সে রাজশ্রীমণ্ডিত মুখখানি তোমায় দেখিয়ে আমি ভবিষ্যদ্বাণী করি, এ বালক আমার মত হবে ? সেই মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তই তোমার আধুনিক ভারতের প্রতিষ্ঠাতা। আর চন্দ্রগুপ্তের আদর্শ ছিল কে, প্রেরণা ছিল কে ? এই আলেকসান্দের। তারপর থেকেই স্বদেশী বিদেশী রাজা সম্রাট একের পর একে এসে ভারতকে বর্দ্ধিত পুষ্ট সংহত ক'রে তুলেছে। শিক্ষা দীক্ষা শিল্প কলা সব দেখ—সবই ত আমার পরে, গ্রীসের প্রভাব তার গায়ে গায়ে লেগে আছে, গ্রীসই সে সবকে জাগিয়ে তুলে তোমার দেশে ছাইয়ে ফেলেছে। গ্রীসের পথে পরে এসেছে পারস্য মোগল ইংরেজ—বিদেশীরা তাদের ঐশ্বর্য্য তোমাদের ভাণ্ডারে ঢেলে

দিয়েছে বলেই তোমরা পেয়েছ কালিদাস, অজন্তা, তাজমহল।

পুরু

ইতিহাসের ব্যাখ্যা তুমি আর দিও না, আলেকসান্দের। ভারত পূর্ব্বে কি ছিল, তা বুঝ্‌বার ক্ষমতা যদি তোমার থাক্‌ত, তবে তোমার হাতে একটি জ্ঞানী একটি সাধকও প্রাণ হারাত না। আমিও সে কথা তুলবো না। শুধু বল্‌বো এই, বিদেশীর অস্ত্রাঘাতের পরেও ভারত যদি জীবনের পরিচয় দিয়ে থাকে কোথাও কোথাও, তাতে তোমাদের কিছুই কৃতিত্ব নেই। তোমাদের জন্য নয় তোমাদের সত্ত্বেও সে জীবন-প্রতিভা ফুটে বেরিয়েছে। এত পাষাণ চাপের ভিতর দিয়েও যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সব বেরিয়েছে, তা দেখেই তুমি আশ্চর্য্যান্বিত। সে পাষাণ চাপ যদি না থাকৃত তবে

দেখ্‌তে ভারতের কি অপরূপ মূর্ত্তি। ভারতের অমর অন্তরাত্মা কোথাও লুকিয়ে আছে আপনাকে প্রকাশ কর্‌বার জন্যে, তারই পরিচয় পাই এ সবে।

আলেকসান্দের

তুমি ভুলে যাচ্ছ, পুরু, পৃথিবীতে নিঃসঙ্গ পৃথক আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ কেউ থাক্‌তে পারে না, তা সে যত মহৎ শক্তিমান জাতিই হোক্, আর মানুষই হোক্। বিশুদ্ধ কোন জিনিস নেই—সবই গড়ে উঠেছে আদান প্রদানের ফলে। এই আদান প্রদান যে কর্‌তে পারে না, সেই মৃত বা মরণাপন্ন। বড় ছোটকে দিচ্ছে, ছোট বড়র কাছ থেকে গ্রহণ কর্‌ছে। আবার ছোটরও যদি কিছু দেওয়ার থাকে তবে বড়কে দিচ্ছে, বড়ও তা নিচ্ছে। চিরকাল এই হয়ে আস্‌ছে—একে বাধা দিতে যাওয়া মস্ত ভুল। চেয়ে দেখ আজকালকার জগৎ,

এখন বেশ স্পষ্ট বুঝ্‌বে সমস্ত মানবজাতি কেমন এক শিক্ষা এক ভাব, এমন কি এক সমাজ এক রাষ্ট্রের দিকে ক্রমে এগিয়ে চল্‌ছে।

পুরু

সেই রকম দেখাচ্ছিল বটে, কিন্তু এক হওয়ার অর্থ যে একাকার হওয়া নয়, সে ভুলও ধরা পড়েছে। নিজত্বকে বজায় রাখ্‌তে হবে। প্রত্যেককে স্বতন্ত্র হতে হবে, স্বধর্ম্ম পেতে হবে। আত্মকর্ত্তৃত্বকে বলি দিয়ে একটা বিপুল যন্ত্রের— বিশেষতঃ পরের গড়া যন্ত্রের অংশীভূত হয়ে যাওয়ার কোন সার্থকতা নেই। জগতের বৈচিত্র্য যে নষ্ট করতে যাবে, সে জগতকে বানিয়ে ফেল্‌বে একটা নিথর জড় পদার্থ!

আলেকসান্দের

আর বৈচিত্র্য অর্থ যদি হয় স্ব স্ব প্রধান হয়ে

ওঠা, নিজেকে বিশুদ্ধ রাখ্‌তে গিয়ে কূপমণ্ডুক হয়ে পড়া, স্বধর্ম্ম হারানোর ভয়ে নিজের নিজের চারদিকে চীনে দেয়াল তুলে দেওয়া তবে সে ক্ষুদে ক্ষুদে জীব সে ক্ষুদে সমাজও জগতে বেশী দিন জীবন্ত হয়ে টিকে থাক্‌বে না।

পুরু

আমি বলি "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ"; পরের সাথে মিল্‌তে মিশ্‌তে যাওয়ার আগে চাই নিজেকে পাওয়া। নিজেকে পাওয়ার জন্যে যদি পরের সংস্রব সব ত্যাগ কর্‌তে হয় তা'ও ভাল। ক্ষুদে নিজত্ব বৃহৎ পরত্বের অপেক্ষা অনেক গরীয়ান। আমি সাম্রাজ্যের সাধক নই, আমি সাধক স্বারাজ্যের।

৭

ইশা খাঁ, কেদার রায়

ইশা খাঁ

গৃহ-কলহই আমাদের কাল হয়েছে। নতুবা মানসিংহের সাধ্য কি দ্বাদশ আদিত্যের সম্মুখে দাঁড়াতে সাহস পায়? আমাদের এক একজন আলাদা আলাদা ভাবে কেউ ত সে মহাবীরের চেয়ে খাট ছিল না। আমরা প্রত্যেকেই বারবার প্রত্যক্ষ প্রমাণিত করে দিয়েছি তোমারই সে গরিমাময় গর্ব্বান্বিত কথা—তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্যঃ। তবুও আমাদের জয় টিক্‌লো না। বঙ্গ রাজ্য এক হ'লো না, স্বাধীন হ'লো না।

কেদার রায়

কেন হবে? পাপের উপর কখন পুণ্যের রাজ্য

প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। যে লোক নারীর মর্য্যাদা রক্ষা করতে জানে না ; নিজের লালসার পরিতৃপ্তির জন্য অবলার জাতি ধর্ম্ম নষ্ট করতে পারে, সে হাজার বীর হোক্, শত যুদ্ধে জয়ী হোক্, তাকে দিয়ে কোন মহৎ কার্য্য হতে পারে না, তার সব প্রয়াস ক্ষণভঙ্গুর হতে বাধ্য, অপরের প্রয়াসকেও সে ব্যর্থ ক'রে দেয় পরিণামে।

ইশা খাঁ

তোমার ভগ্নীর কথা বলছ ? কিন্তু সে ত আমার ধর্ম্মপত্নী। আমি তাঁকে ধর্ম্মতঃ গ্রহণ করবার জন্যে তোমাদের কাছে হাত পেতেছিলেম। আমার আবেদন তোমরা যে শুধু প্রত্যাখান করলে তা নয়, সে আবেদনের প্রত্যুত্তরে আমার রাজ্য আক্রমণ করলে। আত্মরক্ষার জন্য তাই আমাকে দাঁড়াতে হ'লো। আর তোমার ভগ্নীর অমতে

আমি কিছু করি নি। তার প্রমাণ, তোমারই বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সে নিজের জীবন দিয়েছে।

কেদার রায়

তুমি বিদেশী, তুমি বিধর্ম্মী—হিন্দুনারীর প্রাণের কথা বুঝ্‌বার তোমার সামর্থ্য কোথায়? তুমি জোর করে তাকে হস্তগত কর্‌লে সে নারী হয়ে আর কি কর্‌তে পারে? দুষ্ট ঘটনার চক্রে যে অবস্থায় সে পড়ে গেল, উদ্ধার নাই দেখে সময়ের কর্ত্তব্য সে করে গেছে শুধু। তার ত দ্বিতীয় পথ ছিল না।

ইশা খাঁ।

সে তোমাদের সমাজের গুণে। যাহোক্‌, কেদার তুমি বীর বটে, কিন্তু তদনুরূপ তোমার মনের প্রসার কই? জাতের উপরে মানুষ, সমাজের উপরে দেশ। তাই ত আমি বল্‌ছিলেম, এ সামান্য কথাটা বুঝ্‌তে না পেরে, এক এক আদিত্য

হয়েও আমরা আমাদের সাধারণ শত্রুর কিছু করতে পারি নি, আমাদের সবাইকার যে ইষ্ট তার সাধনায় সিদ্ধ হই নি। অতি সহজেই শত্রু এক জনের বিরুদ্ধে আর এক জনকে দাঁড় করতে পেরেছে।

কেদার রায়

তোমারই পথ তবে প্রশস্ত ছিল। নারীর কুলশীল নষ্ট করতে তুমি পশ্চাৎ পদ হও নি, এই তোমার সমাজ-নীতি। আর রাজনীতি? নিজের ঔদার্য্য দেখিয়ে তুমিই মানসিংহকে বন্ধু ভাবে আলিঙ্গন করেছ, তুমিই সম্রাটের হাত থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করেছ, সব রকমেই মোগল তোমার কাছ থেকে সুবিধে করে নিয়েছে।

ইশা খাঁ

আমি চেয়েছিলেম আমার জীবনের কর্ম্মের

সঙ্গিনী। তাই আমি দেখি নি, তার কুল গোত্র জাতি ধর্ম্ম। আমি দেশকে চেয়েছিলেম, তাকে সেবা করবার জন্যে শত্রুর সাথে যুঝ্‌তেও যেমন অগ্রণী ছিলেম তেমনি আবার প্রয়োজন অনুসারে সন্ধি কর্‌তেও বিমুখ হই নি। কেদার, তোমার হিন্দু রাজ্যের স্বপ্ন মহৎ হতে পারে, কিন্তু তার সম্ভাবনা খুবই কম। বঙ্গদেশের চাই জাতি ধর্ম্মের ঐক্য, চাই বিভিন্ন শক্তি-কেন্দ্রের ঐক্য। তোমাদের দিকে আমি ত বন্ধুত্বের জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেম, তোমরা গ্রহণ কর নি। তাই সার্ব্বাঙ্গীন ঐক্যের জন্য আমি অপেক্ষা কর্‌ছিলেম। যত দিন তা হয় নি, তত দিন মোগলের সাথে সন্ধি দরকার ছিল, বৃথা শক্তি ক্ষয় কর্‌তে আমি চাই নি। আর বিজিত হয়ে আমি সন্ধি করি নি, আমি জয়ী হয়েই সন্ধি করেছি।

কেদার রায়

বিদেশীর বিধর্ম্মীর সাথে আবার সন্ধি কি? বঙ্গদেশ হিন্দুর বাঙ্গালীর রাজত্ব—তুমি ইশা খাঁই হও, আর দিল্লিতে সম্রাট আকবরই হোন, তোমরা সকলেই ভিন্ন দেশের ভিন্ন জাতির, এ দেশের সাথে তোমাদের নাড়ীর টান হতে পারে না। আমাদের দেশে ধর্ম্ম-ভেদ, জাতি-সঙ্কর তোমরাই এনেছ। দেশের প্রাণ হচ্ছে সমাজ, সেই সমাজে যেখানে ঐক্য নেই, সেখানে রাষ্ট্রেও ঐক্য থাকতে পারে না। বঙ্গদেশের সমাজে তোমাদেরই দৌলতে ফাটল ভাঙ্গন ধরেছে। বিভিন্ন বহুল কেন্দ্রে কখন ঐক্য হয় না, ঐক্যের জন্য চাই এক শক্তির কেন্দ্র, এক প্রেরণার উৎস; একই দেহে একটা সজীব মাথাই দরকার, তার বেশী নয়। বহু কেন্দ্র বহু শক্তি যেখানে, তাদের মধ্যে মিলমিশ

হওয়া অসম্ভব ; যদিই বা মিলমিশ হয় তবে সেটা ক্ষণিক, তা সাময়িক সুবিধা এনে দিতে পারে কিন্তু তাতে প্রাণের চিরন্তন মিল হয় না, বৃহৎ কিছু সাধিত হয় না। শ্রীপুরকে আমি বঙ্গের সমাজের রাষ্ট্রের একমাত্র শক্তি-কেন্দ্র করে তুল্‌তে চেয়ে-ছিলেম।

ইশা খাঁ

তুমি চেয়েছিলে শ্রীপুর, প্রতাপাদিত্য চেয়েছিল যশোহর, সীতারাম চেয়েছিল মহম্মদপুর, শোভাসিংহ চেয়েছিল বর্দ্ধমান, তাই ত একের পর একে সবাইকে ব্যর্থ-মনোরথ হতে হয়েছে। আমাদের উচিত ছিল এক কেন্দ্রের লোভ ত্যাগ করে বহু কেন্দ্রকে একই লক্ষ্যে সংগ্রথিত করা। সেই উদ্দেশ্যেই আমি তোমার ভগ্নির পাণিগ্রহণ কর্‌তে চেয়েছিলেম, সেই উদ্দেশ্যেই সম্পূর্ণ প্রস্তুত হবার

পূর্ব্বে শত্রুর সাথে সহজেই সন্ধি করি। অবস্থা না বুঝে, বাস্তবের দিকে না তাকিয়ে কেবল গায়ের জোরে কতদূর এগুতে পার, তার পরিচয় তোমার নিজের পরিণাম।

কেদার রায়

ভগবান বিমুখ ছিলেন, হয় ত আমার সে চরম সামর্থ্য ছিল না—কিন্তু বাঙ্গলার শিক্ষাদীক্ষার সমাজের ধর্ম্মের অটুট একত্ব বজায় রাখ্‌তে হবে, বাঙ্গালীর শক্তিকে এক কেন্দ্রগত হয়ে উঠ্‌তে হবে। যে অবস্থার দিকে তাকায়, আগে হতেই সন্ধির জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়ে, সে শক্তিকেও পাবে না, সুবিধাকেও সৃষ্টি কর্‌তে পার্‌বে না। আমি প্রাণ দিয়েছি, সন্ধি করি নি। প্রাণ দিয়ে প্রাণ জাগাতে হয়। নতুবা সন্ধি আরম্ভ কর্‌লে তার কি শেষ আছে?

ইশা খাঁ

তুমি বঙ্গের ভাবুক প্রাণ। কিন্তু আমিও এই বঙ্গেরই সন্তান। আমার অতীত যাই হোক্ না কেন, এই মাতৃভূমির জন্যেই আমি এনেছি আমার অতীতের সম্পদ। তা গ্রহণ কর্‌লে দেশের উপচয় ব্যতীত অপচয় হবে না, আর তা গ্রহণ কর্‌তেই হবে, অব্যর্থকে খোদার দানকে অস্বীকার করবার জো নেই।

কেদার রায়

তোমার কথার প্রমাণের জন্য আমি এখনও অপেক্ষা করছি।

৮

সুলতান মাহ্‌মুদ, ফের্‌দৌসী

মাহ্‌মুদ

বলিহারী তোমার কবিত্বশক্তি, ফের্‌দৌসী! সাধে কি তোমায় সভাকবি ক'রে আমি নিয়েছিলেম। যে সব অসাধারণ অভিনব বিশেষণে তুমি আমায় বিভূষিত করেছ, যে স্তুতির ছটায় আমাকে গৌরবান্বিত করেছ, তা কখনও ভুলবো না! ধন্যবাদ সেজন্য! এমন বেসাতি আমি কোন দিন করিনি তোমায় কিনে, অর্থ আমার এমন সার্থক কোন দিন হয় নি!

যে

তোমার মত অর্থগৃধ্নু নরপিশাচ, লুঠ তরাজ করেই যার সারাজীবন কেটে গিয়েছে, সে অর্থের

সার্থকতা ছাড়া আর কি বুঝ্‌তে পারে? মাহ্‌মুদ, তুমি ভারবাহী বলীবর্দ্দ মাত্র। তোমার সভায় জ্ঞানী গুণীজন অনেক জমায়েত করেছিলে বটে, কিন্তু জ্ঞানের গুণের রসভোগও করনি, তার মর্য্যাদাও বুঝ্‌তে পার নি।

মাহ্‌মুদ

আমি তা চাই-ও নি। আমি চেয়েছিলেম আমার জন্যে বাহার-অলঙ্কার। বিদেশীর ভাণ্ডার থেকে হীরা জহরৎ যেমন কেড়ে এনেছি গজনীকে সাজিয়ে তোলবার জন্যে, রমণী-রত্ন দিয়ে যেমন আমার হারেম সমৃদ্ধ করেছি, সেই রকম তোমাদের মত কথার কলমের বাহাদুর সব জোগাড় করেছি আমার দরবারের শোভাবর্দ্ধনের জন্য। তার বেশী নয়। সে কথা যাক্, কিন্তু ফের্‌দৌসী, তুমি অন্ততঃ বল্‌তে পার্‌বে না, অর্থলিপ্সা আমার চেয়ে তোমার কিছু

কম। কথার মূল্য ত দেখি অর্থ দিয়েই তুমি যাচাই কর। আহা বেচারী, দু'চার খণ্ড ধাতুর জন্যে কি কাতরই না তোমরা হয়ে পড়।

ফের্‌দৌসী

কবির কথার মূল্য অর্থ দিয়ে নির্দ্ধারণ হয় না, কবির দুঃখ সে জন্য নয়। কবির দুঃখ মানুষের মূর্খতার জন্য, তোমার মত যে বীরপুরুষ তার মাথায় এতটুকু মগজের অভাবের জন্য, তার প্রাণে এক ফোঁটা রসানুভূতির অভাবের জন্য। কাব্যের মত বেহেস্তের ধন, তোমার হাতে কি সম্মান পেয়েছে—তোমার ভিক্ষামুঠি তারই চিহ্ন। অর্থের জন্য আমি কাতর হই নি। কাব্যের লাঞ্ছনা দেখে আমি মর্ম্মাহত হয়েছিলেম। আবুসিনা বুঝেছিল তোমাদের কদর, তাই সে তোমার হাতে কোন মতে ধরা দেয় নি। মাহ্‌মুদ, তোমার গজনীসহ

সমস্ত সাম্রাজ্যটি ঢেলে দিলেও তাতে আমার একটি গজলের যথেষ্ট সম্মান করা হয় না।

মাহ্‌মুদ

সাবাস। কথার বীর বট তোমরা। কিন্তু আওরাতেরও সেই বীরত্ব। কবি ও নারী, একই ধরণের জীব। জগতের রূঢ় ঝড়ঝাপ্‌টা, কর্ম্ম-জীবনের দারুণ রৌদ্র গ্রীষ্ম, পৃথিবীর ধূলামাটি তোমাদের সহ্য হয় না, শোভাও পায় না। তাই ত রাজা বাদসার কাজ তোমাদেকে আওতায় রেখে রক্ষা করা, পোষণ করা, অবসর সময়ে তোমাদের মুখের দুই চারিটা খুবসুরৎ বোলি শুনে দেহ মনকে বিশ্রাম দেওয়া, দিলকে খুসী করা।

ফের্‌দৌসী

কথার মহিমা তুমি কি বুঝ্‌বে দস্যু। কথার যে ছন্দ যে সুর যে চিত্র কবি ফুটিয়ে তুলেছেন তা

খোদার কারিগরির মতনই সমান সুন্দর সমান আজব। কবির বাণীর ভিতরে সমস্ত বিশ্ব ধরা দিয়েছে। বাণী থেকেই দুনিয়ার সৃষ্টি, কবির বাণী খোদার দৃষ্টিকে মূর্ত্ত করে ধরেছে। কবির কথা খোদার আঁখির রোসনাই।

মাহ্‌মুদ

তোমাদের সৃষ্টি হাওয়ায়, আসমানে, শূন্যে। যাকে তুমি দস্যু বল্‌ছ, ফের্‌দৌসী, সে তোমার চেয়ে বড় কাব্য সৃষ্টি করেছে। তবে আমার কাব্য কাগজে নয়, আমার কাব্য পৃথিবীর বুকে; তুমি কলম ধরে লিখেছ, আমি অসি দিয়ে এঁকেছি। তুমি সাজিয়েছ হরফ, আমি সাজিয়েছি মানুষ, দেশ। কা'র সৃষ্টি বেশী জীবন্ত, দৃঢ়, মহিমাময়? কা'র মধ্যে খোদার দান বেশী জাজ্জ্বল্যমান?

ফের্‌দৌসী

তার প্রমাণ কার সৃষ্টিটি বেশী স্থায়ী? তোমার সৃষ্টি তোমার সাথেই লোপ পেয়েছে, মাহ্‌মুদ। এত যত্ন, এত চেষ্টা, এত পরিশ্রম তার চিহ্নও কিছু আজ দেখ্‌তে পাও কি? কিন্তু আমার সৃষ্টি যুগযুগান্তর ধরে, দেশে দেশে এখনও মানুষের আনন্দের বস্তু হয়ে আছে। তোমার সৃষ্টিতে ছন্দের চাইতে দ্বন্দ্বেরই মাত্রা বেশী। তোমার সৃষ্টি ক্ষণিকের ভঙ্গুর জিনিষ নিয়ে। তোমার সৃষ্টি অতি বাহিরের, কেবল দেহের।

মাহ্‌মুদ

কিন্তু তবুও তোমরা ত আমাদেরই প্রতিধ্বনি। আমরা বাস্তবে যা করি, তাই তোমরা কথায় বাঁধ। আমরা করি কাজ, তোমরা দাও তার ব্যাখ্যা। আমি যে সাহ্‌নামা জগতের মধ্যে এঁকে

দিয়েছি, ফের্‌দৌসী, তোমার সাহ্‌নামা তার তর্জ্জমা।

ফের্‌দৌসী

তোমাদের কাজ কবির শুধু অবলম্বন, আশ্রয়, ছুতা। গোবরে পদ্মফুল ফোটে, তাতে গোবরের নিজের মাহাত্ম্য কিছু আছে কি? কবি দেখেন একটা অলৌকিক লোক, তার পরিচয় সাধারণের চোখে ধ'রে দেবার জন্যে, তিনি যেখানে যে উপকরণ সুবিধামত পান তাই সংগ্রহ করেন। ক্ষুদ্রকে বিরাট, ক্ষণিককে চিরন্তন, অসুন্দরকে সুন্দর করেন বলেই কবি কবি। বাস্তবই যে সত্য তা নয়, মাহ্‌মুদ।

মাহ্‌মুদ

আমি স্বীকার করি, তোমরা সুন্দরের পূজারী। কিন্তু আমরা শক্তির বিগ্রহ। তাই ত বল্‌ছিলেম

তোমরা আওরাতের তুল্য। সেই হিসেবেই তোমরা দেশে দেশে যুগে যুগে লোকের মনোহরণ কর্‌তে পেরেছ। কিন্তু সুন্দর নয়, শক্তিই জগতের সার বস্তু। শক্তিই মানুষকে সৃষ্টিক্ষম মরদ কর্‌তে পারে, শক্তিই মানুষের মনুষ্যত্বের পরিমাপ। তোমাদের প্রভাব ভাবে, প্রাণে, কিন্তু আমাদের কাজের প্রভাব মানুষের রক্তমাংসের মধ্যে, পৃথিবীর দেহ-কোষের পরতে পরতে লুকিয়ে আছে।

ফের্‌দৌসী

বাহুর শক্তিই একমাত্র শক্তি নয়—সে ত পশুর শক্তি। কবির যা সুন্দর, তারই মধ্যে নিহিত শক্তির উচ্চতম নিবিড়তম প্রকাশ। স্রষ্টারই তপঃশক্তি কবির সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির মূলে, তারই এককণা নীচে নেমে এসে তোমাদের মত বীরকর্ম্মীর বাহুকে শক্তিমান ও উদ্ধত করে তুলেছে।

৯

চন্দ্রগুপ্ত, অশোক

চন্দ্রগুপ্ত

কি কুক্ষণেই তুমি কলিঙ্গদেশে পা দিয়েছিলে, অশোক! কি কুক্ষণেই করুণার মোহ তোমার বীরহৃদয় অভিভূত ক'রে ফেলেছিল! তা না হ'লে, ভারতের ভাগ্য আজ যে আর এক রকম হ'ত না, কে জানে! সামান্য অকিঞ্চিৎকর ঘটনার মধ্যে কি না বিপুল ভবিতব্যই নিহিত থাকে!

অশোক

যথার্থ। তা না হলে, ভারত তার অন্তরের ধন খুঁজে পাবে কি রকমে? কি রকমে ভারতের প্রতিভা ভারত ছাড়িয়ে দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়বে?

কি রকমে অর্দ্ধ-জগৎ শিক্ষায় দীক্ষায় ভারতের শিষ্যত্ব গ্রহণ কর্‌বে? ধন্য সে মুহূর্ত্ত যখন ভগবান তথাগত বালিকা মূর্ত্তি ধ'রে আমার সম্মুখে উপস্থিত হলেন, আমার আসুরী অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করে দিয়ে, সেখানে দিব্য জ্ঞানের স্নিগ্ধ-জ্যোৎস্না ফুটিয়ে তুল্‌লেন! ধন্য আমার সে কলিঙ্গ অভিযান!

চন্দ্রগুপ্ত

তোমার ব্যক্তিগত জীবনের পক্ষে তা মঙ্গলকর হ'লেও হ'য়ে থাক্‌তে পারে, আমি জানিনে, সে প্রশ্নও তুল্‌ছি নে। কিন্তু দেশের পক্ষে তার মত ঘোরতর অমঙ্গলকর বোধ হয় আর কিছু হয় নি। চণ্ডাশোকের নাম যেদিন হলো প্রিয়দর্শী, রাজা যেদিন ভিক্ষু-ধর্ম্ম অবলম্বন কর্‌লে, যোদ্ধারা সব অসির পরিবর্ত্তে ভিক্ষাপাত্র, বর্ম্মের পরিবর্ত্তে চীর ধারণ কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লে, সেই দিনই জান্‌লেম,

চন্দ্রগুপ্তের প্রয়াস বিফল হতে চলেছে। বিচ্ছিন্ন ভারতকে এক ক'রে শক্তিমান মহারাষ্ট্রে পরিণত ক'রে আমি তুলেছিলেম, তুমি যুগযুগান্তরের জন্যে সে কাজ পেছিয়ে দিয়েছ।

অশোক

তোমার আদর্শে তোমার পথে আমিও কিছুদিন চলেছিলেম, কিন্তু ভগবান আমার সে ভুল ভেঙে দিলেন। তোমার পদাঙ্ক অনুসরণে চল্‌লে ভারতের দুর্ভাগ্য বই সৌভাগ্য হ'ত না। তাতে হয়ত ভারত একটা বিপুল আসুরী শক্তি হ'য়ে দাঁড়াত, জগতের পক্ষে তা হ'ত একটা বিভীষিকা। আর শুধু ঐহিক আসুরিক শক্তিতে কে কতদিন বড় হতে পারে? যত বড় সে হবে, তার পতনও তত অবশ্যম্ভাবী, ততই দারুণ। কিন্তু আমি ভারতকে যে শক্তির সন্ধান দিয়েছি, আমি যে সাম্রাজ্য স্থাপন

করেছি, তা দেহ গেলেও, রাষ্ট্র গেলেও অটুট রয়েছে, অটুট থাক্‌বে। ধর্ম্মের সাম্রাজ্য ভারতের এখনও টলে নি, এখনও তা দেশে দেশে আদর্শে শিক্ষায় দীক্ষায় মানব জাতির অন্তরের ধনরূপে প্রতিষ্ঠিত। এ কি আমার ব্যক্তিগত লাভ শুধু ?

চন্দ্রগুপ্ত

সবল দেহ সজীব প্রাণ বিনা কোন অন্তরাত্মার সম্পদ সমর্থ কার্য্যকরী হ'তে পারে না। সুঠাম রাষ্ট্র বিনা একটা জাতির প্রতিভা পূর্ণাঙ্গ হ'য়ে ফুটে উঠতে পারে না। তোমার কল্পনার সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তুমি জগতের উপর ভারত প্রতিভার সূক্ষ্ম প্রভাবই দেখ্‌চ কেবল—কিন্তু চেয়ে দেখ ত বাস্তবের দিকে। অন্যান্য দেশ তোমার ভাবের দ্বারা ভাবজগতে যতই অনুপ্রাণিত হোক না কেন, বস্তু-জগৎ তারা কখনো

তাই বলে ভুলে যায় নি। ভারত তোমার পথে এক চক্ষু হয়ে চলেছে, তাই সে আজ দীন দরিদ্র দুর্ব্বল পরপদানত শতখণ্ডে বিদীর্ণ। শরীরকেই বাঁচিয়ে বর্ত্তিয়ে রাখ্‌বার যার যোগ্যতা নাই, তার আবার অন্তরের ধন খোঁজ কর্‌বার সামর্থ্য বা অবসর কোথায়? তাই ত দেখ, বাহিরের জীবনে পঙ্গু হ'য়ে ভিতরের জীবনেও সে পঙ্গু হয়ে গেছে। ধর্ম্মের জীবন্ত বিকাশ কোথায় ভারতে? ভারতবাসীর ধর্ম্ম? সে ত কেবল আচার-পালন, কায়ক্লেশে কতকগুলি নিয়ম মেনে চলা। বাহিরের অসামর্থ্য তার ভিতরে জাগিয়ে তুলেছে ভয়, তাই ধর্ম্মাচরণ করে সে পাপের ভয়ে,—গভীর জীবন্ত সত্য উপলব্ধির জোরে নয়। প্রাণশক্তি যেখানে ক্ষীণ, শরীরই যেখানে জীর্ণ শীর্ণ, অন্তরাত্মাও সেখানে বিকশিত হ'তে পারে না।

অশোক

কিন্তু দৈহিক বল, রাষ্ট্রনৈতিক বলই যে শক্তির গোড়া তা আমি মানিনে। গোড়ায় চাই অন্তরাত্মার বল। এই বল যার আছে, তার প্রাণে দেহে দেখা দেয় নূতন এক শক্তি। ধর্ম্ম-বলই যে দেহে প্রাণে কি সামর্থ্য এনে দেয় তার প্রমাণ কি তুমি দেখ্‌ছ না? সমস্ত বৌদ্ধ যুগটা তোমার সম্মুখে। এই যুগে জ্ঞানে, কর্ম্মে, শিল্পে, বাণিজ্যে ভারত যে কত বড় জীবন্ত হয়ে উঠেছিল, তার চিহ্ন ত এখনও অটুট হয়ে বর্ত্তমান, সেই যুগের শিক্ষা দীক্ষা আধুনিক মানুষকে কতখানি অনুপ্রাণিত করেছে, তার প্রমাণ ত দুর্ল্লভ নয়। তবে ইদানীন্তনকালে ভারতের যে পরাধীনতা, যে বিচ্ছিন্নতা, যে দৈন্য-দারিদ্র্য তার কারণ অন্যত্র খুঁজ্‌তে হ'বে। আমি বলি, ধর্ম্মকে সত্যের পথ হারিয়েই এমন হয়েছে।

আমি যে আদর্শ দিয়েছিলেম, তা থেকে যেদিন সে বিচ্যুত হয়েছে, সেদিন থেকেই ভারতের পতনের আরম্ভ। বাইরের পতন ঐ ভিতরের পতনের ফল মাত্র।

চন্দ্রগুপ্ত

সে ভিতরের পতনও আরম্ভ হয়েছে তোমার নূতন ধর্ম্ম দিয়ে, তোমার অন্তরাত্মার নূতন প্রেরণা দিয়ে। বৌদ্ধযুগের যে কৃতিত্ব তুমি দেখাচ্ছ, তাতে বৌদ্ধধর্ম্মের অধিকার কতখানি, সেটা বিচারের বিষয়। তোমার ধর্ম্মের আদর্শ ত সন্ন্যাস, বৈরাগ্য, নির্ব্বাণ—নির্ব্বাণের চর্চ্চার ফলে সৃষ্টি, এটা কোন ন্যায়? জাতীয় প্রচেষ্টা বল, শিল্পকলা বল,—সব রকম সৃষ্টিই ত তোমার ধর্ম্মের বিরোধী। তা নয়, ভারতের জীবন তখনও ছিল, আমি যে নবপ্রাণ জাতির মধ্যে উদ্বুদ্ধ ক'রে দিয়েছিলেম তার

জের তখনও ছিল—যতদিন ছিল ততদিন ভারত সৃষ্টি করেছে। তবে তোমার ধর্ম্ম একটা নূতন ভাবতরঙ্গ এনে দিয়েছিল, কতকগুলি নূতন বিষয় চোখের সামনে তুলে ধরেছিল, ভারতের জীবন্ত প্রাণ সেগুলিকে আশ্রয় ক'রে আত্মসাৎ ক'রে নিজেকে প্রকাশ করেছে মাত্র। তার আরও প্রমাণ, এই প্রাণ যতদ্দিন ভারতের ছিল ততদিন সৃষ্টি হয়েছে, তারপর তোমার ধর্ম্ম যখন অতিমাত্র সে প্রাণকে অভিভূত ক'রে ফেল্‌লে, তখন ভারতবাসী বাস্তবিকই বুঝ্‌লে সব ঝুটা, কিছুই নয়, বৈরাগ্য নির্ব্বাণই সার—কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ —তখন সত্যসত্যই তাকে কৌপীন প'রে, দীন-দরিদ্র অল্পপ্রাণ অক্ষম হ'য়ে পড়্‌তে হ'ল। যার যেমন শ্রদ্ধা। লক্ষ্মীকে ভারতবর্ষ যেদিন থেকে তুচ্ছ তাচ্ছীল্য করেছে, সে দিন থেকে লক্ষ্মীও

তাকে পায়ে ঠেলেছে। পূর্ব্বের কিছু সুকৃতি ছিল, তাই ক্ষয় হয়েছে তোমার বৌদ্ধ যুগের ঐশ্বর্য্যে।

অশোক

কিন্তু এ ত একটা ব্যাখ্যা মাত্র—বাস্তবকে সহজভাবে না দেখে, বিকৃত ক'রে দেখা—গুণের ভাগটি সমস্ত নিজের কোলে নিয়ে, দোষের ভাগটি অপরের উপর চাপিয়ে দেওয়া। তথাগত যে অন্তরের প্রেরণা ভারতবর্ষে জাগিয়ে দিয়েছিলেন, তার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি সর্ব্বস্বত্যাগী শ্রমণের জীবনে। কিন্তু সেই প্রেরণাই অন্যদিকে শিল্পী-প্রতিভা খুলে দিয়েছে, কর্ম্মীর কর্ম্মকে নতুন ছাঁচে ঢেলে দিয়েছে। নির্ব্বাণ হচ্ছে চরম লক্ষ্য। কিন্তু যে সাধনায় সেই চরম সিদ্ধি, সেই সাধনাই অন্তরের শ্রেষ্ঠ শুদ্ধ প্রেরণা সব ফুটিয়ে তোলে, ঐ এক লক্ষ্যে চালিয়ে দেয়, জীবনের সব ধারাকে বিকশিত করে ঐ এক

অভিব্যঞ্জনায়। নির্ব্বাণ অর্থ এমন নয় যে রাজা রাজ্যপালন ছেড়ে দেবেন, শিল্পী তাঁর শিল্পকর্ম্ম বন্ধ রাখ্‌বেন, গৃহী তাঁর গৃহকর্ম্মে বিরত হবেন। তা নয়। সবাই আপন আপন কর্ম্ম কর্‌বে, কিন্তু সে সব কর্ম্মকে ঐ সুদূরের সুরে গেঁথে দিতে হবে। এবং সকলের শেষে কর্ম্মশেষ হ'য়ে গেলে, সকল প্রেরণা ক্রমে ক্ষয় হ'য়ে গেলে তখন চরম শান্তিতে আপনাকে স্তব্ধ ক'রে দিতে হবে।

চন্দ্রগুপ্ত

এটাও তোমার নির্ব্বাণ-ধর্ম্মের ব্যাখ্যা মাত্র। কিন্তু এতে প্রমাণ হয়, আমার রক্ত তোমার শরীরে বর্ত্তমান, ভারতের ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রভাব হ'তে তুমি সম্পূর্ণ মুক্ত হ'তে পার নি। সে কথা থাক্, কিন্তু তোমার কথাই যদি সত্য হবে, তবে অর্থনীতিক রাষ্ট্রনীতিক ক্ষেত্রেও তোমার নির্ব্বাণধর্ম্মের সৃষ্টি

ফুটে উঠ্‌লো না কেন? এখানে নির্ব্বাণের সৃষ্টি কিছু হয় নি, সকল সৃষ্টিরই নির্ব্বাণ হয়েছে। তোমার প্রভাবে দেশবাসী যখন পরিচ্ছদের মধ্যে একখানা মলিন কার্পাস বস্ত্র, গন্ধদ্রব্যের মধ্যে একটুকু চন্দন বা কর্পূরই সার কর্‌লে, তখন ভারতের পণ্যজীবী সম্প্রদায়ে কি হাহাকার পড়ে গিয়েছিল তার খবর রাখ কি? কত মণিমাণিক্য, কত বহুমূল্য কৌষেয় ক্ষৌম বস্ত্র, কত গন্ধানুলেপন, কত দ্রব্য-সম্ভারেই না ভারত ঐশ্বর্য্যান্বিত ছিল, দেশ-বিদেশের সাথে কত বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল, সে সকলই একে একে লোপ পেতে চল্‌লো। সৌন্দর্য্য সাধনার অভাবে সারা দেশ হতশ্রী হয়ে পড়্‌ল! আর রাষ্ট্রনীতিক ক্ষেত্রে দেশের শান্তিশৃঙ্খলা খসে পড়্‌তে লাগ্‌লো, দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, সমাজের যত নিম্নস্তরের লোক—শঠ, দস্যু, লুঠেরা—তারা

সুযোগ পেলে। প্রত্যন্ত দেশের রাজশক্তি—পশ্চিমে যবন দক্ষিণে চোল পাণ্ড্য, পূর্ব্বে বঙ্গ আবার যুদ্ধ ঘোষণা করতে আরম্ভ করলে; তখন আর বাহুবল নাই, আছে অহিংসা, কারুণ্য, মৈত্রী, তাই উৎকোচ দিয়ে তাদের শান্ত করবার চেষ্টা করতে হ'ল। ভারতের বিপুল দুর্ভাগ্যের আরম্ভ এই রকমে।

অশোক

ভোগের জীবন পশুর জীবন। আমি সমাজে একটা ত্যাগের তপশ্চরণের আদর্শ প্রতিষ্ঠা ক'রে দিয়েছিলেম, তাতে যদি কারো অনর্থক অর্থ-লাভের উপায় বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে, তাতে আমি দুঃখিত নই। ঐশ্বর্য্যের উপর আকর্ষণ পারত্রিক মঙ্গলের অন্তরায়। ভারত যে ভোগভূমি নয়, ভারতের আছে একটী ত্যাগী তপস্বী আত্মসম্বুদ্ধ অন্তরাত্মা,

এই সত্যটি সারা দেশের লোকের প্রাণে প্রাণে গেঁথে দেওয়া দরকার হয়েছিল, তাই শরীরের প্রসাধনের জালজঞ্জাল সব নষ্ট যে হয়েছে, তা মঙ্গলের ছাড়া অমঙ্গলের নয়। তারপর যে অরাজকতার কথা বল্‌ছ তা আমি থাক্‌তে হয় নি। আমার পরে আমার কাজটি চালাবার মত লোকের উদ্ভব হ'ল না, নতুবা এই নতুন ধর্ম্ম যদি আরও সম্যকরূপে প্রচারিত হ'ত, বিদেশীর প্রাণ যদি এই ছাঁচে ঢেলে গড়া হ'ত, তবে দেখ্‌তে, কি শান্তির, কি যদৃচ্ছাসন্তুষ্টির, কি অধ্যাত্মমুখী জীবন মানব সমাজে ফুটে উঠ্‌তো।

চন্দ্রগুপ্ত

হাঁ, মানব সমাজ তবে হ'য়ে পড়্‌তো ভিক্ষুকের সমাজ—দুর্ব্বল, দুঃস্থ, কুৎসিত। কিন্তু তা যে একেবারে হয় নি, সে তোমার চেষ্টার ত্রুটির ফলে

নয়। তুমি থাক্‌লে হয়ত আরও কিছু কর্‌লেও কর্‌তে পার্‌তে—কিন্তু বাস্তবিক ও-রকমটি হয় না, মানুষের প্রাণের সত্তাকে কতদিন তুমি চেপে দাবিয়ে রাখ্‌তে পার? মানুষের প্রাণ চায় মুক্ত প্রসার, শক্তির খেলা, ঐশ্বর্য্যের অভিব্যক্তি। সামাজিক জীবনে তাই চাই লক্ষ্মীর, কার্ত্তিকেয়ের প্রতিষ্ঠা, চাই বর্দ্ধিষ্ণু অর্থ-প্রতিষ্ঠান আর সমর্থ রাষ্ট্র।

অশোক

তবে সমাজ-ব্যবস্থায় ধর্ম্মের মোক্ষের স্থান নাই, কেবল কাম ও অর্থই সব? সাধারণ মানুষ ত কাম ও অর্থই চায়, চায় প্রাণের বাসনার খেলা, তাই সাধারণ সমাজের গঠনও সেই রকম হয়েছে। কিন্তু মানুষ মানুষ, কারণ এই প্রাকৃত সমাজকে ভেঙ্গে বদ্‌লে একটা আদর্শের ছাঁচে ঢেলে গড়্‌তে চায়—

কামে ও অর্থে পরিতৃপ্ত না হ'য়ে মানুষ তার জীবনে ফুটিয়ে তুল্‌তে চায় অন্তরাত্মার—ধর্ম্মের, মোক্ষের ব্যঞ্জনা।

চন্দ্রগুপ্ত

অন্তরাত্মা, ধর্ম্ম, মোক্ষ—এ সব নাম মাত্র—এ সবের অর্থ কি? এ সবের মধ্যে প্রাণের খেলার স্থান নাই? চরম লক্ষ্য যদি মোক্ষই—নির্ব্বাণই হয়, তবুও ধর্ম্ম বল্‌তে সন্ন্যাস বৈরাগ্য বা তোমার অষ্টাঙ্গ সাধনাটুকুই কেবল বুঝায় না। ধর্ম্ম অত সহজ বস্তু নয়। ধর্ম্মের ধারা বহুধা জটিল। অন্তরাত্মার প্রকাশ নানাভঙ্গিম। সমাজের এক একটি অঙ্গ এক একটি ধারাকে আশ্রয় ক'রে চলেছে, আর সকলে মিলেই ফুটিয়ে তুলেছে একটা পূর্ণ সার্ব্বাঙ্গীন ধর্ম্মের আদর্শ। তুমিই ত স্বীকার করেছ, ধর্ম্মের সাধনা নানা জনের পক্ষে নানা রকম। ব্রাহ্মণের

যেমন এক ধর্ম্ম, তেমনি আছে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, তেমনি আছে বৈশ্যের ধর্ম্ম, তেমনি আছে আবার শূদ্রের ধর্ম্ম। ত্যাগ, সংযম, প্রীতি, এ সব এক বিশেষ শ্রেণীর কর্ত্তব্য। এ সব হচ্ছে তাঁদের ধর্ম্ম, যাঁরা সমাজের অন্তরের সম্পদকে বাঁচিয়ে বর্ত্তিয়ে রাখ্‌তে চান। কিন্তু সমাজের দেহ-প্রাণকেও বাঁচিয়ে বর্ত্তিয়ে রাখা চাই—ধনে ঐশ্বর্য্যে শক্তিতে—তাই প্রয়োজন আবার আর এক শ্রেণীর লোক। এই দুটি বিভাগ দুই রকম ধাতুর লোকের উপর ন্যস্ত; অথবা এই দুই রকম কাজ একই সাধকের বিভিন্ন অবস্থায় হতে পারে। কর্ত্তব্য হিসাবে, স্বভাব হিসাবে এই বর্ণ বিভাগ ও আশ্রম বিভাগ যদি না থাকে, তবে সমাজে এসে পড়ে গোলমাল, বিশৃঙ্খলা —পরিণাম তার ধ্বংস।

অশোক

কিন্তু এ কি দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত সত্যের সমন্বয় করার অসম্ভব চেষ্টা নয়? ভগবান তথাগত এই জন্যেই কি ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন না? এক দিকে ত্যাগ অহিংসা আর এক দিকে ভোগ হিংসা, এই দুই ধারা একই সমাজের বুকে স্থান পেলে সে সমাজ যে খণ্ডিত হয়ে পড়বে, সে সমাজই যে ধ্বংস পাবে তা'ত আশ্চর্য্য নয়। দুটি বিরোধী ধর্ম্মের মধ্যে সামঞ্জস্য চলে না, এদের একটীকেই বরণ ক'রে নিতে হবে। নতুবা গোঁজা-মিল দিয়ে দুই শত্রুকে এক-সঙ্গে বেঁধে রাখবার চেষ্টা করলে তার মধ্যে দ্বন্দ্বের বীজ থেকে যাবে। তা ছাড়া সমাজে এ রকম ভেদনীতি বৈষম্য অনর্থক মনান্তর সৃষ্টি করে। শূদ্রের বেদপাঠে অধিকার নাই, আশ্রমের পর আশ্রম পার না হয়ে গেলে

মোক্ষসাধনা কেউ করতে পারবে না—এই যে অন্যায় অসঙ্গত ব্যবস্থা, এরই জন্যে ব্রাহ্মণ্যসমাজের এমন দুর্ব্বলতা ও এমন অধঃপতন।

চন্দ্রগুপ্ত

বৈষম্য প্রকৃতির নিয়ম—তুমি আমি তা সৃষ্টিও করি নি, তা উল্টাতেও পারি না। প্রত্যেক মানুষের আছে পৃথক পৃথক স্বভাব, এবং সেই স্বভাবকে ভিত্তি করেই যে স্বধর্ম্ম গড়ে ওঠে তাই হয় সত্য আর স্বাভাবিক। নিরীহ সাত্ত্বিক কিছু সকলে হতে পারে না, একেবারে সাধু ব'নে যেতে পারে না। কারো থাকে জ্ঞানের বল, কারো থাকে বা শরীরের জোর। কারো প্রতিভা খোলে স্থূল বস্তু নিয়ে নাড়াচাড়া করায়, আর কারো প্রতিভা খোলে সূক্ষ্ম বস্তু নিয়ে। মানুষে মানুষে এ বৈষম্য স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু বৈষম্য থাকলেই যে দ্বন্দ্বও

থাকবে এমন কোন কথা নেই। ব্যক্তিগত জীবনে কখন কোন অবস্থায় সে দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে, সেটা তার অন্তরে সাধনার কথা। কিন্তু সমাজে সমষ্টিগত জীবনে এ রকম দ্বন্দ্বের স্থান নেই। সামাজিক ব্যবস্থার উদ্দেশ্যই হচ্ছে এই রকম নানা স্বভাবের জন্য নানা ক্ষেত্র সৃজন ক'রে, একটা উচ্চতর উদ্দেশ্যের লক্ষ্যের সুরে সবগুলিকে বেঁধে রাখা। তোমার আধ্যাত্মিক সাধনা সেই চরম উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হ'তে পারে। কিন্তু অধিকারীর স্বভাব অনুসারে সেই সাধনার নানা স্তর ও ভঙ্গী আছে। তাই ত বৈশ্য-শক্তির ক্ষত্রিয়-শক্তির উদ্ভবও প্রয়োজন। আর কিছুর জন্যে না হোক্, সমষ্টিগত আধ্যাত্মিক সাধনার জন্যেই দরকার ঐ দুই শক্তি। দৈন্যের পীড়ন থেকে মুক্ত যে সমাজে আছে প্রাচুর্য্য, অরাজকতা উচ্ছৃঙ্খলতার পরিবর্ত্তে যেখানে চলছে

সুনিয়ম ও শান্তি—বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় শক্তি যেখানে গড়ে তুলেছে একটা সজীব সুনিবদ্ধ জীবন-আয়তন, সেখানেই ত সম্ভব জ্ঞানের চর্চ্চা, অধ্যাত্মের সাধনা। সমাজের যে অধ্যাত্ম-চূড়া তার গোড়া বেঁধে দিয়েছে একটা সমর্থ বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় শক্তি। রাষ্ট্রশক্তি আর কিছু না করুক, তা দেশের গড়ে দেয় ধর্ম্মজীবনের আধিভৌতিক বনিয়াদ।

অশোক

তা আমি মানি নে। যে রাষ্ট্র ভোগশক্তির, বাহুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত তার সমাজের প্রতি অঙ্গে রেখে যায় সেই ভোগবাসনার সেই আসুরী শক্তির ছাপ। তার মধ্যে একটা জাতিগত ধর্ম্ম-শৃঙ্খলা গড়ে উঠ্‌তে পারে না। সমস্ত জাতিটাকে যদি আধ্যাত্মিক ছাঁচে ঢালতে হয়, তবে গোড়া থেকে আরম্ভ করতে হবে, রাষ্ট্রকে একেবারে সম্পূর্ণ নূতন

ভিত দিতে হবে। উচ্চ নীচ, ব্রাহ্মণ শূদ্র, পুরুষ নারী প্রত্যেকে যে পরস্পর বিরোধী ধর্ম্ম নিয়ে চলবে, তা হ'লে হবে না। সবাইকে একই আদর্শে একই পথে একই ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়াতে হবে—তবেই সমাজে একটা সঙ্ঘবদ্ধ অটুট জমাট ধর্ম্মশক্তি বাঁধবে।

চন্দ্রগুপ্ত

তুমি চিরকালই একরোখা একচোখো মানুষ রয়ে গেলে, অশোক! এক সময়ে একটি ভাবের বেশী তোমার মাথায় স্থান পায় না। যখন প্রথমে তুমি ছিলে যোদ্ধা, সম্রাট—তখন তোমার মত আর কেউ বোধ হয় এমন বোঝে নি যে বলং বলং বাহুবলং। আবার যখন তুমি হঠাৎ সাধু হয়ে পড়লে, তখন ত্যাগ অহিংসা করুণা মৈত্রীকে চরম ক'রে আঁকড়ে ধরলে। কিন্তু এই দুইএর কোন

ভাবই স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। শক্তি ও প্রীতির সামঞ্জস্য আছে, হতে পারে। আদর্শ মানুষে, আদর্শ সমাজে উভয়েরই সমান স্ফূর্তি। বাহুবল ঘৃণ্য নয়, বাহুবলের সাথে অন্তরাত্মার বলের দ্বন্দ্বই থাক্‌বে এমন কোন কথা নেই। বাহুবলও অন্তরাত্মার বলেরই অভিব্যক্তি হতে পারে। ভারতের প্রাচীন সাধনা দেহের সাথে আত্মার, ঐহিকের সাথে পারত্রিকের একটা সমন্বয় চিরদিনই করে এসেছে। তোমার তথাগত একটা নতুন তথ্য এনে সে সাধনাকে ভেঙ্গে দিয়ে একটা অযথা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তবুও বুদ্ধদেব তাঁর সাধনা নিয়ে একটা আলাদা ক্ষেত্র তৈরী করে তাতেই সন্তুষ্ট ছিলেন—তুমি কিন্তু এক ক্ষেত্রের ধর্ম্মকে আর এক ক্ষেত্রের উপর চাপিয়ে দিয়ে, মঠের সন্ন্যাসের যে সাধনা তাকে সমষ্টিগত জাতীয় জীবনের সাধনায়

প্রয়োগ করে ধর্ম্মশঙ্কর সাধনাবিপর্য্যয় এনেছ মাত্র।

অশোক

কিন্তু মানুষের এই সাধারণ জীবনের মধ্যেই ত সেই অসাধারণ জীবন ফুটিয়ে ধর্‌তে হবে—কারণ সেই জীবনের, সেই জগতের সত্যই সত্য। আমার কর্ত্তব্যই ছিল তাই। ভগবান তথাগত ব্যক্তির অন্তরের জীবনের যে সত্য দিয়েছেন, আমি তাকে সমাজের দেশের জীবনে মূর্ত্ত করে ধর্‌তে চেয়েছি।

চন্দ্রগুপ্ত

সেখানেই ত তোমার ভুল। তুমি ভুলে যাচ্ছ, তুমি রাজা। যে কাজের কথা তুমি বলছ তা ত রাজার কাজ নয়। সে কাজ ভিক্ষুর, সাধু-সন্ন্যাসীর, ধর্ম্ম-প্রচারকের। তোমার যদি সে কাজেরই উপর টান হয়েছিল, তবে রাজদণ্ড পরিত্যাগ করে, ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্র থেকে দূরে সরে তা করা

উচিত ছিল। বুদ্ধদেব নিজে তাই করেছিলেন। রাজ-সিংহাসনে বসে রাজ-ধর্ম্মই পালন করতে হয়। রাজা হচ্চেন ক্ষত্রশক্তির কেন্দ্র—তাঁর উপর ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম চাপিয়ে, তুমি দুটি বিভিন্ন কর্ম্ম-ক্ষেত্রকে একসঙ্গে জড়িয়ে মিশিয়ে গোলমাল পাকিয়েছ।

অশোক

রাজধর্ম্ম কি যুদ্ধ বিগ্রহ, ভোগ ব্যসন নিয়ে? দেশের সমাজের যিনি শীর্ষ স্থানে, তিনি যে পথে চলবেন, যে পথ ধরিয়ে দেবেন, সর্ব্বসাধারণে ত সেই পথেই তাঁকে অনুসরণ করবে? রাজা নিজে যদি অসুর হন, তবে প্রজাকে দেবতা হতে বলা কি সম্ভব?

চন্দ্রগুপ্ত

সৃষ্টির বৈচিত্র্যই মহাসত্য। অসুরের সত্য

আছে, দেবতার সত্য আছে, এ জগতের সত্য আছে, ও-জগতের সত্য আছে—প্রত্যেক মানুষের পৃথক পৃথক সত্য আছে। সব সত্যকে একাকার ক'রে নয়, প্রত্যেকের সত্যকে ফুটিয়ে ফলিয়ে সার্থক ক'রে ধরতে পারে যে সত্য, তাই পূর্ণ সত্য।

অশোক

দার্শনিক তত্ত্ব হিসাবে তোমার কথা সত্য হতে পারে। কিন্তু সেটা হচ্ছে প্রকৃতির স্বাভাবিক লীলা—মানুষের মানুষত্ব প্রকৃতির লীলায় মানুষের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করা।

চন্দ্রগুপ্ত

মানুষের আদর্শ প্রকৃতির ধর্ম্মকে এড়িয়ে বা জোরজবরদস্তি করে চলতে পারে না প্রকৃতিকে পরিপূর্ণ করাই মানুষের সার্থকতা।

অশোক .

প্রকৃতির জয় করাই মানুষের সাধনা, তাতেই প্রকৃতির যথার্থ পরিপূরণ।

১০

শান্তি, সূর্য্যমুখী, কপালকুণ্ডলা

শান্তি

মর্ত্তের লীলা অনেককাল ছেড়ে এসেছি, বোন, পৃথিবীর টান স্মৃতির অনেক তলে ডুবে গিয়েছে। তবে এ জাগরণ কেন? আবার কি দিন এলো? আবার কি কাজের ডাক পড়েছে? তপস্যার সিদ্ধি তবে হলো? জীবনের কর্ম্মে জীবনের সঙ্গিনী হয়ে ধর্ম্মক্ষেত্রে আবার শক্তিমূর্ত্তি ধারণ করতে হবে?

সূর্য্যমুখী

তা জানি না, বোন। আমার কর্ম্ম কি আছে তাও জানি না, আমার শক্তি কোথায় সে খোঁজও লই নি। তবে জীবনে মরণে আমি যাঁর পদপ্রান্তে,

জন্মে জন্মে আমি তাঁরই অনুসরণ করে চল্‌বো। মর্ত্তে হোক, স্বর্গে হোক আর নরকেই হোক আমি সর্ব্বত্র সর্ব্বদাই স্বামীর ছায়া। এই ত নারীর ধর্ম্ম, এই ত নারীর কর্ম্ম। এর বেশী নারীর আর কি আশা আকাঙ্ক্ষা সুখ সৌভাগ্য থাকৃতে পারে? স্বামী কোথায় কি অবস্থায় আছেন তা জানতে আমার কৌতূহল নাই! আমার এক কাজ তাঁর সেবা, আমার সকল তৃপ্তি তাঁর চরণে আমার ভালবাসাটুকু ঢেলে দিয়ে।

শান্তি

ঠিক কথা, বোন। স্বামীর সেবা করবে, ভালবাসা দিয়ে তাঁকে পরিপূর্ণ রাখবে—এই ত নারীর আদর্শ। কিন্তু আমি বলি, আদর্শ নারী সেই যে জানে স্বামীর সেবা কিসে হয় তাঁর পরিপূর্ণতা কোথায়? শরীরের সেবা অধম দান,

হৃদয়ের ভালবাসা মধ্যম দান, কিন্তু উত্তম দান অন্তরাত্মার তপোবল। জান না কি, বোন্, নারীর আর এক নাম শক্তি কেন? জীবনের ব্রতে আমরা সাথী, উত্তর-সাধিকা। পুরুষকে যদি আমরা শক্তি না দিতে পারি, তবে তার যে শক্তিটুকু আছে তাও অপহরণ করবো। শিবের শিবত্ব প্রতিষ্ঠিত কোথায়? গৌরীর তপস্যার উপর।

সূর্য্যমুখী

দেবতার কথা জানি না, কিন্তু আমরা মানুষ। মানুষের মধ্যে নারীর স্থান চিরদিনই গৃহে। নারী গৃহলক্ষ্মী। বাহিরে কর্ম্মের যে যুদ্ধক্ষেত্র আয়াস-প্রয়াসের যে কোলাহল তা পুরুষেরই জন্যে। পুরুষের এ বাহিরের জীবনক্ষেত্রে নারীকেও কেন আপন-হারা হ'য়ে ঝাঁপ দিতে হবে? পুরুষের চাই একটা আশ্রয়-স্থান, জীবনের চাই একটা অন্তরমুখী

নীড়, নারীর কাজ সেইটিকে গড়ে তোলা, সেইটুকুকে শান্তিতে স্বস্তিতে ঐশ্বর্য্যে সুন্দর সুনিবিড় করে গুছিয়ে তোলা। পুরুষ যে ছুটতে চায় কেবলই বাহিরের দিকে, কেবলই আপনাকে ছড়িয়ে উচ্ছৃঙ্খল করে উধাও হয়ে,—নারীর কাজ সেইটিকে প্রেম-প্রীতির বন্ধনে, হৃদয়ের রসে সংযত করে, আত্মস্থ করে ধরে রাখা। নারীর শক্তি পুরুষের বাইরে-ছোটায় সাহায্য ক'রে নয়, নারীর শক্তি পুরুষকে অন্তরের-দিকে টেনে আনায়। নারী পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গিনী—পুরুষের অন্তরের যে অর্দ্ধ, সেইখানেই নারীর সব অধিকার সব কর্ত্তব্য।

শান্তি

নারী পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গিনী, সত্য কথা, সূর্য্যমুখী। কিন্তু তার চেয়ে বড় সত্য, নারী পুরুষের সহধর্ম্মিনী। গৃহে নারী পুরুষের গৃহলক্ষ্মী, কিন্তু জীবনের কর্ম্মে

নারী পুরুষের বীরজায়া, সহকর্ম্মী। এই খানেই ত নারীর মহত্ত্ব। পুরুষকে আমাদের আনন্দ যেমন দিতে হবে, শক্তিও তেমনি দিতে হবে। কাজের ক্ষেত্রেও পুরুষকে একলা ছেড়ে দেব কেন? সেখানেও তার সাথে থাকব, দেহ মন প্রাণ দিয়ে সর্ব্বদা ঘিরে রাখ্‌ব। স্বামীর কর্ম্মের, ব্রতের ভার যদি গ্রহণ না করলেম, তবে তাঁর জীবনের অর্দ্ধেকটাই কি হারালেম না?

সূর্য্যমুখী

কিন্তু জ্ঞান নাকি নারীর আসল নারীত্ব হচ্ছে মাতৃত্ব। এই মাতৃত্বের যে মহাব্রত, তাই নারীর একমাত্র ব্রত। এখানে যেমন পুরুষের অধিকার নেই, সেই রকম পুরুষের যে বাহিরের জীবনের কর্ম্ম সেখানেও নারীর হস্ত অনাবশ্যক। পুরুষের ক্ষেত্রে নারী যদি হস্তক্ষেপ করতে যায় তবে তার

আপনার ধর্ম্মের সমূহ ক্ষতি হবেই। গৃহে সন্তানকে ভবিষ্যৎ মানুষকে গড়ে তোলাই নারীর ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জীবনের সার্থকতা।

শান্তি

সন্তানের উপর কর্ত্তব্য মাতারও আছে, পিতারও আছে। পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধের ওটি একটা দিকের কথা মাত্র—কিন্তু সে কথা সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়।

কপালকুণ্ডলা

তোমাদের দুজনারই কথা আমার কাছে অবোধ্য। পুরুষ ও নারী নিয়ে তোমাদের যে বিতর্ক তার মূল সূত্রটাই আমি ধরতে পারছি নে। পুরুষ ও নারীকে একসঙ্গে বেঁধে দিতে তোমরা এত ব্যস্ত কেন? পুরুষ এক জীব, নারী এক জীব, তাদের স্বামী স্ত্রী হয়ে, অর্দ্ধাঙ্গ অর্দ্ধাঙ্গিনী হয়ে,

মিলতে মিশতে হবে—কেন ? কি উদ্দেশ্যে ? কোন প্রয়োজনে ?

শান্তি

কপালকুণ্ডলা ! তুমি বনের প্রাণী, সমাজের খবর রাখ না। মানুষকে থাকতে হয় সমাজ বেঁধে। আর সমাজের প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে পুরুষ ও নারীর মিলন রহস্যে। বিধাতা যে দিন মানুষকে গড়েছেন, সেই দিনই সমাজের উৎপত্তি হয়েছে, সেই দিনই তারা যুগলে যুগলে মিলে, কেন্দ্রে কেন্দ্রে গৃহ রচনা ক'রে মানুষত্বের সাধনা করেছে।

সূর্য্যমুখী

যে নারী সংসারে ধরা দেয় নাই, পৃথিবীতে বৃথা তার জন্ম। নিজেকেও সে জানল না পেল না, পরকেও সে জানল না, পেল না। বিধাতার সৃষ্টি যে কোন আনন্দে বিধৃত তার খোঁজ পেল না।

পুরুষ নারীর, স্বামী স্ত্রীর রহস্য বোঝাবার জিনিষ নয়, বোন।

কপালকুণ্ডলা

তোমাদের সমাজ তোমাদের সংসার কি এতই সুন্দর এতই মনোরম? কিন্তু আমার যে অভিজ্ঞতা দু'চার দিনের জন্য জুটেছিল, তা এখনও একটা দুঃস্বপ্নের মত আমার মাথায় চেপে আছে। সমাজ! সংসার! সে ত দারুণ কারাগার। দাম্পত্যবন্ধন! সে ত বন্ধন মাত্র। মুক্তি, স্বাধীনতা, যদৃচ্ছা-গতি —এর চেয়ে স্বস্তির স্বাস্থ্যের আনন্দের আর কি হ'তে পারে? উঃ! ভালবাসার অত্যাচারের মত আর অত্যাচার আছে? পুরুষের সাথে মিলিয়ে জীবন, কি অসম্ভব দাবীদাওয়ার জীবন—সে জীবন কি সাধে আমায় ত্যাগ করতে হয়েছে?

শান্তি

হাঁ, এই দাবী-দাওয়া নিয়েই জীবন। দুর্ভাগ্য তোমার, সে জীবন তোমার ফুটে উঠ্‌তে পেলে না। এই দাবীদাওয়া, এই ভালবাসার অত্যাচারেই মানুষের বিশেষত্ব, মানুষ-জীবনের সার্থকতা। দুই'এর আদান-প্রদানের ভিতর দিয়েই, মানুষের অন্তরাত্মা কেবল যে পরম আনন্দের অধিকারী হয় তা নয়, একটা পূর্ণতর বৃহত্তর সমৃদ্ধিই লাভ করে।

কপালকুণ্ডলা

তোমরা যাকে বল্‌ছ মানুষের বিশেষত্ব, জীবনের সার্থকতা, আমি তাকে বলি সংস্কার। মানুষ ত আর এক ভঙ্গীতেও জীবনের সার্থকতা পেতে পারে— তার সমাজকে গড়ে নিতে পারে। মানুষ মানুষ— পুরুষও মানুষ, নারীও মানুষ। ত্বং কুমারঃ উত বা কুমারী—জান ত ঋষিদের কথা? মানুষের

প্রত্যেকেরই আপন আপন পথ, আপন আপন কর্ম্ম, আপন আপন ধর্ম্ম। নিজের মুক্ত অন্তরাত্মার প্রেরণায় চলেই, নিজের স্বচ্ছন্দ আনন্দের ঐশ্বর্য্যকে ফুটিয়ে চলেই প্রত্যেক জীবের যথার্থ সার্থকতা। অপরের সাথে নিজেকে বেঁধে দিয়ে, নিজত্ব মানুষ হারাতে যাবে কেন? আমার মনে হয়, এই রকম করেছে বলেই মানুষের জীবন সমাজ উন্নত হয়ে উঠ্‌তে পারছে না, তা হয়ে পড়েছে এমন দীনহীন এমন বিশৃঙ্খল। তোমাদের সমাজে থেকে মানুষ তার আত্মার স্বাধীনতা হারিয়েছে, তাই দেখি যুগে যুগে দেশে যে সব মহাপ্রাণ সে বলিদানে সম্মতি দিতে পারে নাই, তাঁরা সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনী হয়ে বেরিয়ে গেছেন।

সূর্য্যমুখী

মানুষের কর্ত্তব্য করার ধৈর্য্য ও সামর্থ্য তাঁদের

ছিল না। যুগে যুগে দেশে দেশে সমস্ত মানবজাতির মধ্যে যে জিনিষটা অবিচ্ছিন্ন ধারায় চলে এসে জীবনকে রসায়িত মুঞ্জরিত করে তুলেছে, সেইটে বটে মিথ্যা সংস্কার আর তোমার মত দু চার জন যারা সে ধারার অমৃতরস পান করবার সুবিধা পায় নি তারাই হল সত্যনিষ্ঠ। সংসারকে যারা এ রকমে ফাঁকি দিতে চেষ্টা করেছে, তারা অহঙ্কারী আত্মসর্ব্বস্ব বলেই এরকম করেছে—কিন্তু পরিশেষে তারা নিজেরাই ফাঁকিতে পড়েছে।

শান্তি

আমি অতদূর যাই নে। তাঁরা যা করেছেন সেটি হচ্ছে সমাজের বাইরের আদর্শ। কিন্তু সে বাইরে-যাওয়ার রাস্তাও এই সমাজের ভিতর দিয়েই। ব্যক্তিগত ভাবে যদিও আমি মনে করি নে যে, সে বাইরে-যাওয়ার একান্ত প্রয়োজন

আছেই--তবুও আমি বলি ও-দুটিতে কোন বিরোধ নেই—দুইই হচ্ছে একই রাস্তার জের।

কপালকুণ্ডলা

বাঁধন আমি কোন কালেই চাই না। মানুষ নিজের আনন্দে নিজের মহিমায় নিজে দাঁড়িয়ে উঠুক। নিজের অন্তরাত্মা, নিজের ভিতরে ভগবান, তার চেয়ে বড় কিছু নেই। আমি চাই মুক্তি, স্বাধীনতা, নারীর জীবাত্মারও স্বাতন্ত্র্য।

সূর্য্যমুখী

মানুষের অন্তরাত্মা মানুষের অন্তরাত্মার সাথে জড়িয়ে তবে এক, নতুবা তা খণ্ড। দুটি খণ্ড জীব যখন হৃদয়ের বিনিময়ে এক হতে পেরেছে, তখনই তারা স্বেচ্ছাচারী না হোক প্রকৃতই মুক্ত হয়েছে। নারী সেই পথ দেখিয়ে চলেছে—আত্মদানে, ভালবাসায়, প্রেমেই নারীর মুক্তি ও পূর্ণানন্দ।

শাস্তি

নারী শক্তি—নারী তপঃশক্তি। কপালকুণ্ডলা! তুমি বোধ হয় নারীকে জ্ঞানের পথ দেখিয়ে দিচ্ছ, সূর্যামুখী। তুমি দেখিয়ে দিচ্ছ প্রেমের পথ কিন্তু আমি সবার উপরে শক্তিরই মাহাত্ম্য দেখ্‌ছি নারীর নারীত্বে।

১১

সাবিত্রী, দ্রৌপদী

সাবিত্রী

নারী একবারই নিজেকে ঢেলে দিতে জানে, দুইবার নয়। নারী এক পুরুষেরই কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারে, দুই পুরুষের কাছে নয়। নারীর প্রাণ জন্মে জন্মে একই দেবতার চরণে অখণ্ডভাবে নিবেদিত—সতীর সত্তা উচ্ছিষ্ট হবার নয়। তোমার জীবনের রহস্য কি তবে, দ্রৌপদী!

দ্রৌপদী

তোমার জীবনের যে রহস্য, আমার জীবনেরও সেই রহস্য—সকল নারীর, সকল সতীর জীবনেরই

সেই রহস্য। আমার জীবন প্রাণও জন্মে জন্মে একজনেরই কাছে সর্ব্বতোভাবে সমর্পিত!

সাবিত্রী

সে কি? পঞ্চপাণ্ডবের কথা তবে কাহিনী মাত্র? কবির কল্পনা তোমাকে নিয়ে ত বড় নিষ্ঠুর, বড় অন্যায় খেলা খেলেছে।

দ্রৌপদী

কাহিনীও নয়, কবি কল্পনাও নয়। আমি পঞ্চপাণ্ডবেরই ছিলাম সহধর্ম্মিণী।

সাবিত্রী

তুমি বল্‌তে চাও, তুমি ছিলে মিথ্যাচারিণী? গোপনে বরণ করে নিয়েছ একজনকে আর প্রকাশ্যে আত্মবিক্রয় করেছ আর একজনের—কেবল একজনেরও নয়, আর বহু জনের কাছে? এই তোমার তেজ, তোমার নিষ্ঠা—তোমার নারীত্ব?

কিন্তু জানতে পারি কি, দ্রৌপদী, কে—কে ছিল তোমার প্রাণের দেবতা, তোমার সত্যকার পতি। অর্জ্জুনের সম্বন্ধে কি একটা কথা শুনেছিলাম, তাই তবে সত্য ?

দ্রৌপদী

আমার সত্যকার পতি—অর্জ্জুনও নয়, পঞ্চ ভ্রাতার কেউ নয়, সাবিত্রী।

সাবিত্রী

তুমি এই স্বীকার করলে তুমি পঞ্চপাণ্ডবের সহধর্ম্মিণী, আবার বলছ তোমার পতি এঁদের কেউ নয়, আর এক ব্যক্তি। আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে, তোমার হেঁয়ালী ভেঙ্গে সাদা কথায় বল ত শুনি।

দ্রৌপদী

আমার প্রাণের দেবতা যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ।

সাবিত্রী

কি বল তুমি? তবুও ত কিছুই বুঝতে পারছি না। তবে আবার পঞ্চপাণ্ডবের সহধর্ম্মিণী হলে কি রকমে?

দ্রৌপদী

সহজ কথা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে আমি উৎসর্গীকৃত—তাঁরই নির্দ্দেশ মত আমি চলেছি। তিনি আমাকে যে আদেশ দিয়েছেন অকুণ্ঠিত-চিত্তে আমি সেই আদেশই পালন করেছি।

সাবিত্রী

ভগবান ত সবারই অন্তরে। এক হিসেবে তিনি সবারই পতি—কি পুরুষ, কি নারী। কিন্তু জীবনে যিনি আমার পতি, আমার নারীত্বের যিনি অধিকারী তিনি আমারই মত মানুষ—জীবনের ব্রতে তিনিই আমার জাগ্রত ভগবান;

ভগবানকে যদি পাই তবে তাঁরই মধ্যে, তাঁরই সহায়ে।

দ্রৌপদী

আমার কৃষ্ণও মানুষ, আমার নারীত্বের একমাত্র অধিকারী পুরুষ—তিনিই আমার মানুষী দেবতা।

সাবিত্রী

সে দেবতা তবে তোমায় গ্রহণ করলেন না কেন নিজে? এমন ত নয় যে পত্নী হিসেবে তিনি কাউকে গ্রহণ করেন নাই। তা না করে তিনি ঠেলে দিলেন তোমাকে আর পাঁচ জনার কাছে—এ কোন নীতি, কোন ধর্ম্ম?

দ্রৌপদী

সে বিচারের ভার আমি লই নাই। নীতি ধর্ম্ম আমি সব জলাঞ্জলি দিয়েছি তাঁরই আদেশের মধ্যে। ধর্ম্ম যে কি তা আমি জানি, কিন্তু তাতে

আমার কোন অনুরাগ নাই; অধর্ম্ম যে কি তাও জানি, তাতেও আবার আমার বিরাগ নাই— আমার হৃদয়স্থিত হৃষীকেশ যে ভাবে আমায় নিযুক্ত করছেন আমি সেই কাজই করে চলেছি।

সাবিত্রী

তুমি না হয় এই রকমে অব্যাহতি পেলে। কিন্তু আমার প্রাণ তাতে সায় দিতে পারছে না। ভগবান ধর্ম্মাধর্ম্মের অতীত হলেও, তিনি অধর্ম্মের প্রশ্রয় দেবেন কেন, নিজেই অধর্ম্মাচারী হবেন কেন? তাঁহাতেই ত পরম ধর্ম্ম—

দ্রৌপদী

সে ধর্ম্ম মানুষের ক্ষুদ্রবুদ্ধির নয়, সে তাঁর নিজের ধর্ম্ম। মানুষের পরিচিত সংস্কারগত অনেক ধর্ম্মকেই তা ব্যাহত করে চলে।

সাবিত্রী

মানুষের সমাজ তা হলে থাকে কি রকমে? সমাজকে উৎসন্ন দেওয়াইত ভগবানের ইচ্ছা নয়। সমাজের মধ্যে যে সব ধর্ম্ম ফুটে উঠেছে, তাতে কি ভগবানেরই নির্দ্দেশ নাই, সে সকলও কি ভগবানের নিজের হাতের গড়া নয়?

দ্রৌপদী

কিন্তু সমাজে কি একটা বিশেষ ধর্ম্ম দেখা দিয়েছে? চেয়ে দেখ, দেশ ভেদে কাল ভেদে কত সমাজে কত রকম ধর্ম্ম ফুটে উঠেছে। তোমার কথাই যদি ঠিক হয়, তবে এ সব গুলিকেই সমান ভাবে স্বীকার করতে হয়। সাবিত্রী! তুমি নিজের পক্ষে স্বধর্ম্ম বলে যেটা জেনেছ, সেটাকেই শুধু সকলের ধর্ম্ম বলে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছ কেন? পুরুষ নারীর যে একই অকাট্য ধরণের সম্বন্ধ হতে পারে তা ত

নয়। সমাজের প্রয়োজনেই এ সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। বিভিন্ন সমাজের প্রয়োজন বিভিন্ন, তাই পুরুষ নারীর সম্বন্ধের রূপও বিভিন্ন। এক পতীত্ব, এক পত্নীত্ব, বহু পতিত্ব, বহু পত্নীত্ব মানুষের সমাজে এ সব রকম ব্যবস্থাই ত রয়েছে।

সাবিত্রী

স্বীকার করি। কিন্তু মানুষের হৃদয়ে একটা আদর্শ আছে—একটা উচ্চতম সত্য আছে। সকল সমাজ সে আদর্শ, সে সত্য ধরতে পারে নি। যে সমাজ পেরেছে সে সমাজ তত উন্নত আর যে পারে নি সে তত অনুন্নত, অপরিণত। যে মানুষ যে নরনারী এই আদর্শ, এই সত্য জীবনে ফলিয়ে ধরেছে তারাই শ্রেষ্ঠ।

দ্রৌপদী

সত্যই তাই কি? তোমার নিজের ব্যক্তিগত যে

সংস্কার, তোমার নিজের সমাজের যে ব্যবস্থা তার উপর ঐকান্তিক শ্রদ্ধাবশত তাকে তুমি সকলের উপর স্থান দিচ্ছ না ত? আদর্শের কথা যদি বল আর এও যদি স্বীকার কর যে আদর্শে আদর্শেও ইতর বিশেষ আছে, তবে সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আদর্শ কি ভগবান স্বয়ং নহেন?

সাবিত্রী

কিন্তু স্বয়ং ভগবানকে কে দেখেছে, কে জোর করে বলতে পারে এইটিই তাঁর ব্যবস্থা?

দ্রৌপদী

আমি ভগবানকে দেখেছি, আমি জোর করে বলতে পারি আমি অনুসরণ করেছি তাঁর ব্যবস্থা—একটুখানি মানুষী দৌর্ব্বল্য আমার মধ্যে দেখা দিয়েছিল হয়ত, আর তার জন্যে আমার নরক দর্শনও হয়েছে।

সাবিত্রী

আমি যখন তা পারি না, আমি যখন দেখেছি আমি মানুষ মাত্র, তখন আমার মানুষী হৃদয়ে যে সত্য যে আদর্শ জ্বলে উঠেছে, তাকেই শ্রেষ্ঠ পদ দিব, তাকেই ভগবানের নির্দ্দেশ বলে অকুণ্ঠিত চিত্তে চলব।

দ্রৌপদী

আমি হয়ত সমাজের মানুষের বাহিরে, সাবিত্রী। আমার পথে তোমাকে কখন চলতে বলি না।

—

১২

স্ত্রী, পুরুষ

স্ত্রী

তুমি আমায় চেয়েছিলে, এই এসেছি তাই। চল তবে, সে অনাস্বাদিত আনন্দ পৃথিবীতে গিয়ে আমরা ভোগ করি। এবার আমাদের অনুমতি হ'য়েছে।

পুরুষ

আমি তোমায় চেয়েছিলাম! কই, কিছুই ত আমার মনে পড়ে না! তোমার মতন কা'কেও যে দেখেছি কখন তা'ও স্মরণে আস্‌ছে না। তুমি ভুল করেছ নিশ্চয়ই।

স্ত্রী

কিন্তু ভুল ত এ জগতে হয় না। আচ্ছা,

মানস-চক্ষে একবার দেখ ত। ঐ খরস্রোতা ত্রিস্রোতা ছুটে চলেছে—ভরা বর্ষা, থৈ থৈ ঢেউ। গোধূলির আকাশে কাল মেঘ ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে। নদীর পাড় দিয়ে পায়ে-চলা পথে যুবক এক দ্রুতপদে চলেছে—মুখে তার কি একটা চিন্তা-কুলতা, দৃষ্টিতে কি একটা উদাস আবেগ। চল্‌তে চল্‌তে হঠাৎ সে থম্‌কে দাঁড়াল, এক নিমেষের জন্য বোধ হয়—এক নিমেষের জন্য শুধু তার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল, ঐ যে অৰ্দ্ধাবৃতা যুবতী ঘাটের উপরে আনমনে বসেছিল তারই উপরে। এক নিমেষেরই জন্যে উভয়ের দৃষ্টি বিনিময় হ'ল, তারপর যুবতীও মুখ ফিরিয়ে নিল, যুবকও আপন পথে চলে গেল। বল ত সে যুবক কে, সে যুবতীই বা কে?

পুরুষ

তুমি, আমি? তোমার কথার সুরে কি একটা

স্বপ্নের মত জিনিষ যেন আমার প্রাণের কোন গভীর অতল থেকে ভেসে উঠ্‌তে চাচ্ছে। হাঁ, এবার মনে পড়ছে। সে একখানা ছবি, আমার খুবই মধুর লেগেছিল। সন্ধ্যার শান্ত-শীতল আলো-ছায়া —মেঘের নীচে দিয়ে কৃষ্ণায়মান জলরাশির ওপারে সূর্য্য ডুবে যাচ্ছে—এপারে নারী এক, স্থির-বিদ্যুৎসন্নিভা, এলায়িত-কুন্তলা, পাশে অনাদৃত শূন্যকুম্ভ, যোগিনীর মত অচঞ্চল, এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ঐ দূরান্তরে, অনন্তের রহস্যের পানে। সকল ভুলে, এমন একখানি পট এক মুহূর্ত্তে চেয়ে দেখতে কা'র না সাধ হয়?

স্ত্রী

কিন্তু সেই এক মুহূর্ত্তের জন্য তুমি আমায় প্রাণ ভরে চেয়েছিলে, আমিও সেই এক মুহূর্ত্তের জন্যই তোমায় স্বীকার ক'রে নিয়েছিলাম। সেই এক

মুহূর্ত্তেই আমাদের কর্ম্মের বীজ উপ্ত হ'য়েছে। এখন তার ফল সংগ্রহের দিন উপস্থিত, তাই তোমায় ডেকে নিতে আমার উপর আদেশ হ'য়েছে।

পুরুষ

কিন্তু সত্য সত্যই ত আর তোমাকে আমি চাই নাই। একটি নূতন কবিতা, একখানা অভিনব আলেখ্য, এক কলি অশ্রুতপূর্ব্ব গান—দিব্য-শিল্পীর একটি অপরূপ শিল্প-সৃষ্টিতে আমি মুগ্ধ হ'য়েছিলাম, তা'র রসাস্বাদনে উৎসুক হ'য়েছিলাম—এই শুধু! তার বেশীতে আমার লোভও ছিল না, আকাঙ্ক্ষাও ছিল না।

স্ত্রী

তার বেশী দরকারও হয় না। ঐটুকু রসাস্বাদন, ঐটুকু আনন্দ ভোগই সকল সৃষ্টির উৎস। অন্তরাত্মার ঐটুকু রসানুভূতিই ডেকে আনে প্রাণের

ভোগ। তোমার রসপিপাসু অন্তরাত্মা তোমার প্রাণকেও রসায়িত তৃষ্ণায়িত করে তুলেছিল। প্রয়োজন ছিল শুধু আমার দিক হ'তে সম্মতি, তাও সে পেয়েছে। তোমার প্রাণের তরঙ্গ আমার প্রাণকে দুলিয়ে দিয়েছে, আমার অন্তরাত্মায় ব'য়ে এনেছে তোমারই অন্তরাত্মা হ'তে একটা মধুমতী ধারা। তোমার জীব-পুরুষের কামনা জেগে উঠে স্পন্দিত ক'রে তুলেছে যে কর্ম্মের সূক্ষ্মগতি, আমার নারীশক্তি তা'কে গ্রহণ করে, মূর্ত্তি দিতে চলেছে। যে আনন্দ-শক্তি আমরা দু'জন মিলে অজ্ঞানে হোক্, সজ্ঞানে হোক—উদ্বোধন করেছি, তার পূর্ণ তৃপ্তি চাই. ইচ্ছা করলেও আর ত তাকে আমরা ফিরাতে পারি না।

পুরুষ

কিন্তু যে বিধাতা আজ আমাকে পৃথিবীতে

পাঠিয়েছেন, তাঁর নির্দ্দেশে আমি চলেছি বিশেষ একটা ব্রত নিয়ে। এবার আমার ভোগের জীবন নয়, আমার কর্ম্মের ক্ষেত্র, আমার ধর্ম্মের ধারা হবে ভিন্ন রকমের। সেখানে নারীর স্থান হবে কিনা সন্দেহ। তাই আমার মনে হয় ক্ষণিকের স্বপ্ন হিসাবেই যে জিনিষের ভোগ হয়ে গেছে, তাকে আর জাগ্রতে ধ'রে ফুটিয়ে তোলবার কোন সার্থকতা নাই।

স্ত্রী

কর্ম্মের গতি অত সহজ ও ঋজু নয়। জীবনের পাটে সহস্র সূত্র ওতপ্রোত ভাবে নানাদিকে নানা ভঙ্গীতে সংমিশ্রিত। তোমার জীবন-বিধাতা তোমায় যে নির্দ্দেশ দিয়েছেন তা' সত্য হ'তে পারে ; কিন্তু ঐটুকুই যে সব সত্য তা তুমি ধ'রে নিয়েছ

কেন ? আমারও জীবন-বিধাতা বল্‌ছেন, তোমারই সাথে মিলিয়ে এবার আমার লীলা।

পুরুষ

কিন্তু সে লীলা তোমার সার্থক হবে কি ? যে কামনার জন্য তুমি আমায় ডাক্‌ছ, তার সমস্ত দাবী-দাওয়া আমার ব্রত মিটাতে পারবে কি ? তৃপ্তির, স্বস্তির জীবন না হ'য়ে, হয়ত আমাদের হ'য়ে উঠবে অতৃপ্তির ব্যথার জীবন। যে সুখের আশে আমরা চলবো, তা হয়ত দুঃখই নিয়ে আস্‌বে। আমাদের মিলনের বুকে ব্যর্থতাই জেগে উঠ্‌বে।

স্ত্রী

মিলনের আনন্দ, মিলনে—সুখে দুঃখে নয়। সুখ দুঃখ, তৃপ্তি অতৃপ্তি, স্বস্তি ব্যথা—এ সবই ছোট জিনিষ, বাইরের ব্যাপার। এই সব দ্বৈতের ভিতর দিয়েই অন্তরের আনন্দ রসানুভূতি লীলায়িত হয়ে

ওঠে। ভিতরের যে সার্থকতা—আমার সার্থকতা, তোমারও সার্থকতা—তার কখন এ সব অন্তরায় হ'তে পারে না। এ সবই হয়ত হবে তার আয়োজনের উপকরণ।

পুরুষ

কে জানে সৃষ্টির রহস্য কি? কি ভঙ্গীতে, কোন্ পথে চলেছে কর্ম্মের গতি? চল তবে, অজানা শক্তির হাতে আমরা ক্রীড়াপুত্তলিকা মাত্র। সে যখন আমাদের ঠেলে দিচ্ছে, তখন তাকে বাধা দেওয়ার সামর্থ্যও আমাদের নেই, ইচ্ছাও থাকৃতে পারে না।

১৩

বুদ্ধ, লাও-ৎস, কং-ফুৎস *

বুদ্ধ

তিক্ত, তিক্ত জীবন-মদিরা !

লাও-ৎস

মধুর, মধুর জীবনের সুধা !

কং-ফুৎস

তিক্তও নয়, মধুরও নয়—জীবনের রস শুধু অম্ল।

বুদ্ধ

আমি স্পষ্ট দেখ্‌ছি তিক্ত, নিঃসন্দেহে তিক্ত। জীবনটা কি? মূর্ত্ত দুঃখ। রোগ, জরা, মৃত্যু—

---

* কং-ফুৎস অর্থাৎ ইংরাজীতে (অর্থাৎ লাতিনে) যাঁহার নাম Confucius (কন্‌-ফুসিয়স্‌)। কং-ফুৎস বিশেষভাবে ছিলেন উত্তর চীনের ধর্ম্মগুরু—তাঁহার ধর্ম্ম

এই ত জীবনের পরিণাম। আর জীবনের চির-সাথী কি? শোক তাপ—লোভ মোহ—হিংসা-দ্বেষ—অন্যায় অত্যাচার—প্রলয় মহামারী। দুঃখের ভূত প্রেত পৃথিবীর বুক জুড়ে চ'রে বেড়াচ্ছে, মানুষ তাদের আহার। এদের কোন প্রতীকার নাই, এদের হাত থেকে পরিত্রাণ নাই—জীবনকে

প্রতিষ্ঠিত নীতি, সদাচারের উপর; তিনি আমাদের দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রকার অর্থাৎ সামাজিক ব্যবস্থা প্রণেতাদের সহিত তুলনীয়। লাও-ৎস ছিলেন বিশেষভাবে দক্ষিণ চীনের ধর্ম্মগুরু—ইঁহার ধর্ম্ম, ইঁহার সিদ্ধান্ত ও সাধনায় আমাদের ঋষিদের বেদান্তবাদ, প্রধানতঃ উপনিষদের আনন্দ-ব্রহ্মবাদের ছায়া অনেকখানি পাই। কং-ফুৎস, লাও-ৎস ও বুদ্ধ প্রায় সমসাময়িক। চীনদেশে একটি কিংবদন্তীতে আছে যে একই ভাণ্ডের মদ্য আস্বাদন করিয়া তিন জনে তিন মত দিয়াছিলেন—বর্ত্তমান কথোপকথনের আরম্ভে তাহাই দেওয়া হইয়াছে। এ সম্বন্ধে একটি বিখ্যাত পুরাতন জাপানী চিত্রও আছে।—লেখক

মানুষ যদি আঁকড়ে ধ'রে থাকে। মুক্তি অর্থ—জীবন হ'তে মুক্তি। তৃষ্ণা, জীবনের তৃষ্ণাই সকল দুঃখের গোড়া। সুতরাং এই তৃষ্ণার নিরাকরণই মানুষের পরম শ্রেয়। আমি তাই শিক্ষা দিয়েছি, আমার সমস্ত সাধনাই এই, জীবন হতে কি ক'রে অবসর গ্রহণ করা যায়, জীবনের স্রোতে যে ভেসে চলেছি তা থেকে কি ক'রে উদ্ধার পাওয়া যায়, জীবনের স্রোতকে কি ক'রে বন্ধ করা যায়। জীবনের নির্ব্বাণই পরি-নির্ব্বাণ।

কং-ফুৎস

একটা দিক তুমি অত্যন্ত বড় ক'রে দেখ্‌ছ, সিদ্ধার্থ, তাই সৃষ্টি তোমার কাছে এমন বিভীষিকা। জীবনে দুঃখ আছে—তুমি যত দৈত্যদানার নাম করলে সবই আছে—তাই বলে' জীবনটা যে ব্যর্থ, তাকে উড়িয়ে দেওয়াই যে পরম পুরুষার্থ, এমন

আমি স্বীকার করি না। অভাব অভিযোগ বেদনা যন্ত্রণা আছে, কিন্তু তাদের উপর কর্তৃত্ব করবার শক্তিও মানুষের আছে। প্রকৃতির উৎপাত আছে, কিন্তু তাতে মানুষজাতি লয় পায় নি। সমাজের অত্যাচার আছে, মানুষ তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে, দাঁড়িয়েছে ও। ব্যক্তির মধ্যে রিপুর লীলা আছে, তাকেও সংযত করা যায়, অন্ততঃ তার বিরুদ্ধে লড়াই করা যায়। সত্য বটে, রোগ জরা মৃত্যুর উপর মানুষের হাত নাই, কিন্তু এই তিনটিই ত জীবনের সব কথা নয়। মানুষের রোগ আছে; স্বাস্থ্য কি মোটেও নাই? জরা আছে; যৌবন নাই? মৃত্যু আছে; প্রাণের উচ্ছ্বাস নাই? জীবন ভাল-মন্দ নিয়ে—ভালকে গ্রহণ কর, মন্দের সাথে যুদ্ধ করতে করতে চল, মানুষের তাতেই মনুষ্যত্ব।

লাও-ৎস

ঠিক কথা—জীবন একটানা সুর নয়। বিচিত্র, বিরোধী গতির ভিতর দিয়ে তা ছন্দায়িত হয়ে উঠেছে। জীবনকে যখন দেখি কেটে কেটে, তখনই একটা অংশের দিকে সমস্ত নজর দিয়ে বলি এখানে রয়েছে সুখ, আবার আর একটা অংশের দিকে সেই রকমই নজর দিয়ে বলি ওখানে রয়েছে দুঃখ—এখানে ভাল, আর ওখানে মন্দ। এর পরের ধাপ হচ্ছে সুখকে, ভালকে না দেখা বা ভুলে যাওয়া—দুঃখকে মন্দকে একছত্র রাজা ক'রে তোলা। কিন্তু জীবনকে ওভাবে দেখা সত্যকার দেখা নয়। দেখ গোটা জীবনকে যুগপৎ, সৃষ্টিকে দেখ ভিতরের অখণ্ড দৃষ্টিতে—দেখ্‌বে সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দের দ্বন্দ্ব ঘুচে গেছে, দেখ্‌বে দুই রকম গতির ছন্দ কিন্তু উভয়ত্রই

রয়েছে আনন্দের আবেগ। "সৃষ্টি আনন্দ হইতে উদ্ভূত, আনন্দের মধ্যেই ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিয়াছে, আনন্দের মধ্যেই যাইয়া মিশিয়াছে।"

বুদ্ধ

সত্যকে বাস্তবকে তুমি খালি চোখে মুখোমুখি দেখতে চাও না, জীবনকে তুমি দেখছ কল্পনার রঙিন কাঁচের ভিতর দিয়া, তাই এখানে তোমার মনে হচ্ছে সবই সুন্দর, সবই আনন্দ! রোগটা, জরাটা, মৃত্যুটা কি বড় সুন্দর, খুব আনন্দের জিনিষ? যার রোগ হয়েছে তাকে জিজ্ঞাসা কর। জরায় যে জীর্ণ তাকে জিজ্ঞাসা কর। মৃত্যু-শয্যায় যে প'ড়ে তাকে জিজ্ঞাসা কর। ভুক্তভোগী কি বলে জান? কবির খোস খেয়াল সত্যের পরিচয় দিতে পারে না।

লাও-ৎস

ভুক্তভোগীর নিরানন্দের খেয়ালও সত্যের পরিচয় দিতে পারে না—ভুক্তভোগীর অনুভূতিও খেয়াল, তবে সেটা তামসিক খেয়াল। বরং কবির খোস-খেয়ালই সত্যের কাছে কাছে গিয়েছে। ফুল ফোটে, শুকিয়ে যায়, ঝরে পড়ে তাতে দুঃখের কি আছে? ফুল ঝরে নতুন জীবের সৃষ্টির জন্য, আবার নতুন ফুল ফোটানোর জন্য। এক যায়, আর আসে, যে যায় সেই ঘুরে আসে। এই যে অবিচ্ছিন্নগতি, এই যে অনন্তযাত্রা—এরই নাম "তা'ও", পথ—আনন্দের চিরপ্রবাহী ধারা, এরই বুকে বুকে আমরা উঠ্‌ছি, ফুট্‌ছি, ডুব্‌ছি, আবার উঠ্‌ছি। এই মহাপথে জন্মের যে তীব্র আনন্দ তারই নাম বেদনা, অসহ্য যে সুখ তারই নাম দুঃখ।

কং-ফুৎস

এখানে আমি সিদ্ধার্থের পক্ষপাতী। জীবনের সবই আনন্দময় কথাটা অতিশয়োক্তি। যে দুঃখ পায়, তাকে যদি বলা হয় ওটা দুঃখ নয় সুখের আতিশয্য, তাতে দুঃখীর দুঃখ কিছুমাত্র লাঘব হয় না—এমন চমৎকার ব্যঙ্গটি উপলব্ধি করার মতও অবস্থা বোধ হয় তার থাকে না। দুঃখ আছে, খুবই দুঃখ আছে জীবনে। জীবন তা হলে জীবন হত না। কিন্তু তাই বলে সিদ্ধার্থের মত আবার জীবনটাকে ছেড়ে যাবই বা কোথায়? মানুষের সকল ধর্ম্ম সকল কর্ম্ম এই জীবন নিয়ে। দুঃখ ত আছে, জীবনের স্বরূপই এই—কিন্তু মুহ্যমান হব না, সহ্য করব, কঠোর হয়ে কর্ত্তব্যের পথে চলব। এই ত মানুষের কথা। জীবনের পথ কণ্টকাকীর্ণ কিন্তু আমার আছে অন্তরের শক্তি, মনের বল।

লাও-ৎস

এই অন্তরের শক্তিটা কি, মনের বলই বা কি? কোন অনুভূতির প্রসাদে জীবনের বাধা আর বাধা বলে বোধ হবে না? আমি বলি চোখের দেখা নয়—চোখ দেখে কেটে কেটে, এককালে একটি জিনিষ আর সে জিনিষটার স্থূল নিরেট রূপ—কিন্তু মানুষ তার চোখের চেয়ে ঢের বড়। তার ভিতরে আছে এমন একটা চেতনা যেখানে জেগে উঠ্‌তে পারলে, ক্ষুদ্র চোখের দেখা সবই তার বদলে যায়। এই বৃহৎ চেতনাই মানুষের সত্যিকার বৃহৎ সত্তা আর তা আনন্দময়। ক্ষুদ্র দৃষ্টি দিয়ে মানুষ যখন দেখে তখনই তার কাছে বোধ হয় যেন আছে শোক তাপ দুঃখ অকল্যাণ আধিব্যাধি প্রভৃতি। কিন্তু এটা আসল সুস্থ দৃষ্টি নয়—এটা ভুল দৃষ্টি, বিকারের দৃষ্টি।

বুদ্ধ

আমিও ত তাই বলি জীবনটা সৃষ্টিটা হচ্ছে আপেক্ষিক সত্য। সমস্ত জীবন-ধারাটাই তৈরী হয়েছে, তুমি যাকে বলছ ক্ষুদ্র দৃষ্টি তাই দিয়ে! ক্ষুদ্র দৃষ্টিটা ভেঙ্গে ফেল, জীবনও ভেঙ্গে যাবে, সকল দুঃখের অবসান হবে! এই ভাঙ্গা, এই অবসানই মানুষের চরম লক্ষ্য। সেটা আনন্দময় কি না, সে প্রশ্ন নিরর্থক। যদি কোন সত্তাই না থাকে, তাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই! আমি বুঝি জীবনের শেষ যেখানে, সেখানে আর কিছু না থাকুক সেটাই হচ্ছে শান্তি; মানুষের পক্ষে তাই দরকারী সত্য।

লাও-ৎস

জীবনের শেষ নয়, জীবনের সমগ্রতা যেখানে সেইখানেই পূর্ণ সত্য। শান্তিও যদি পেতে

চাও, তবে জীবনের বাইরে চলে যাবার কোন প্রয়োজন নাই! চোখের দৃষ্টিটা ক্ষুদ্র বলে, চোখটা নষ্ট করবার সার্থকতা কিছু নাই, স্থূল চোখের পেছনে জাগাও তোমার তৃতীয় নেত্র, তবেই এই ক্ষুদ্র স্থূল চোখেই জগৎজীবন রূপান্তরিত হয়ে ফুটে উঠেছে দেখবে। দেখবে প্রতি খণ্ডে পূর্ণ সমগ্র, প্রতি মুহূর্তে সমস্ত অনন্ত।

কং-ফুৎস

জীবনের শেষ কোথায় জানি না, খণ্ড-মানুষ জীবনটাকে অখণ্ডভাবে কি রকমে ধর্‌বে তাও বুঝি না। মানুষ মানুষ, তার দোষেগুণে যে মানুষত্ব তাই নিয়ে। তার মানুষত্ব লোপ করে দিয়ে কোথায় কি হবে সে বৃথা তর্ক করবার ঔৎসুক্য আমার নাই। মানুষকে আকাশকুসুম দেখিয়ে কি হবে? দেখিয়ে দাও, তার মানুষত্ব

নিয়ে, তার দৈনন্দিন জীবনকে নিয়ে সে কি করবে। পৃথিবীতে তার যে নির্দ্দিষ্ট স্থান কাল সেখানে থেকে তার কি কর্ত্তব্য। তোমরা যে ভাবে নিয়ে মানুষকে বিচার কর্‌ছ, তাতে মনে হয়, যেন মানুষ হাওয়ার জীব, নিজের মধ্যে নিজে সম্পূর্ণ, একলা একলাই সার্থক। কিন্তু তাত নয়। মানুষ পাঁচজনকে নিয়ে—তার সার্থকতা সমাজের সার্থকতার সাথে অনেকখানি মিশে আছে। আর এই সমস্যাই হচ্ছে সব চেয়ে দরকারী সমস্যা—কারণ তা হচ্ছে বর্ত্ত-মানের সমস্যা। আজকার কি সংস্থান সে সম্বন্ধে কিছু উচ্চবাচ্য না করে, তোমরা মাথা ঘামাচ্ছ ভবিষ্যতে কি হবে তাই নিয়ে। আমার সে অবসর নাই—আজ, এই মুহূর্ত্তে মানুষের যে অব্যবহিত প্রয়োজন তারই মীমাংসা আমি যদি দিতে পারি, তবেই নিজেকে সফলকাম মনে করব।

বুদ্ধ

মানুষ যদি তাতেই সুখী হত, তবে আমিও বোধ হয় তোমারই পথে চল্‌তাম। কিন্তু তাত নয়। মানুষ সমাজের মানুষ হলেও কেবলই সেটাকে বন্ধন বলে মনে করছে না, সেটাকে ছাড়িয়ে যেতে চাচ্ছে না? মানুষ চায় যে এমন ব্যবস্থা, এমন একটা মীমাংসা যা শুধু এখনকার নয়, চিরকালের—দেহের মনের প্রাণের সমাজের পরিবারের সকল দাবিদাওয়া মিটিয়েও তার যে একটা প্রশ্ন সর্ব্বদাই জেগে থাকে—ততঃ কিম্‌!

লাও-ৎস

জগতের জীবনের কোন সম্বন্ধই বন্ধনের নয়, যদি সকল সম্বন্ধের মধ্যে রয়েছে যে বৃহত্তর সম্বন্ধ যে সম্বন্ধাতীত সম্বন্ধ তার খোঁজ পাই। জীবনের একান্ত ভিতরেও নয়, আবার একান্ত বাইরেও

নয়, মানুষের সমস্যা এ দুটির মধ্যে যুগপৎ লীলা খেলা।

১৪

দীনশাহ্, পরীজাদ

(১)

দীনশাহ্

পরীজাদ, কি মনোহর আমাদের এই মাজিন্দেরান শহর। ইরাণেও তরুছায়া এমন শীতল এমন মধুর ছিল না। দেখ, কি শান্তির ধারা বক্ষে নিয়ে নদীটি চলেছে। কূলে কূলে তার বাগিচা। বাগিচায় বাগিচায় প্রস্ফুটিত ফুলের গালিচা। সে ফুলে কত সৌন্দর্য্য কত সুরভি। গাছে গাছে পাখীর গান কি কলরোল তুলে দিয়েছে, আকাশে বাতাসে কি অপার্থিব আনন্দের উল্লাস মেখে দিয়েছে। তাদের পালক কত রকমারি,

তাদের রঙই বা কত বিচিত্র—সে মধুর সে উজ্জ্বল ছবি দেখে দেখেই প্রাণ ভরে যায়—তাদের নাম-ধাম জানবার কৌতুহল আর কিছু থাকে না। এখানে এই দু' হাজার বছর ধরে আমরা দেবতার ভোগ ভোগ করে এসেছি। কিন্তু হঠাৎ কেন জানি না ইরাণের স্মৃতি আমার মনে জেগে উঠ্‌ছে। আবার যেন দেখতে ইচ্ছা হচ্চে, জিহুন যেখানে তার জলধারা নিয়ে বয়ে চল্‌ত, যাযাবর তাতারী যেখানে তাদের তাঁবু নিয়ে ঘুরে বেড়াত, দামাস্কনগর যেখানে তার বিপুল ঐশ্বর্য্য নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে আমাদের নিজেদের সেই শহর যেখানে আমাদের পিতা পিতৃপুরুষদের বাড়ী ছুটি পাশাপাশি হয়ে ছিল, সেই যে বাড়ী দুটির বারান্দা থেকে ঝুঁকে আমরা দুজনা দুজনার পানে চেয়ে পরম গোপনে কথাবার্ত্তা কইতাম।

পরীজাদ

আমাদের পুরাণো আবাসে ফিরে যেতে আমারও কোন অনিচ্ছা নেই। তাই বলে মাজিন্-দেরান শহরে আমি যে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছি তা নয়। আমারও প্রাণের ভিতরে কে যেন আ'বার চাচ্ছে পৃথিবীর নশ্বর আনন্দ, সেই ক্ষণিকে-পাওয়া ক্ষণিকে-হারানো অথচ তীব্র পূর্ণ তৃপ্তি। তবে এক কথা, দীনশা, দুটি হাজার বছর কেটে গিয়েছে, যাওয়ার আগে এখন একবার কি দেখা উচিত নয়, আমাদের সে সাধের জায়গা সব কেমনতর মূর্ত্তি নিয়েছে? সেখানে এসেছে আর এক ধরণের মানুষ, আর এক ধরণের ভাষা, আর এক ধরণের আদবকায়দা। তাদের মধ্যে আমরা হয়ত বিদেশীর মত গিয়ে পড়বো, আমাদের হয়ত সেখানে খাপ খাবে না।

দীনশা

আচ্ছা, আমি তবে গিয়ে দেখে আসছি। ততক্ষণ তুমি অপেক্ষা করো, পরীজাদ।

(২)

দীনশাহ্

পরীজাদ, পরীজাদ! পৃথিবীতে আর গিয়ে কাজ নাই। এস, মাজিন্‌দেরান শহরেই আমরা চিরকাল থেকে যাব। পৃথিবী দেখে এলেম, সব বদলে গিয়েছে। তুমি ত ঠিক ঠিকই বলেছিলে, পরীজাদ।

পরীজাদ

কি দেখ্‌লে, কি শুন্‌লে, দীনশা?

দীনশাহ্

দেখ্‌লেম, এক শ্রীহারা পৃথিবী। ঘর বাড়ী সবে রূপ নেই, গড়ন নেই, শৃঙ্খলা নেই—কুৎসিত

রুচির পরিচয় দিচ্ছে তারা, একটা অসম্ভব বাহ্য আড়ম্বরের ভারে মানুষের সৃষ্টি পীড়িত। ইঁটের স্তূপের পর ইঁটের স্তূপ কেবলই চলেছে, কোথাও এতটুকু সবুজের ফাঁক নাই—এই হ'ল মানুষের শহর। একটা বিকট চীৎকার কেবলই সেখান থেকে উঠ্‌ছে, দেখা যাচ্ছে আগুনের হল্‌কা, শোনা যাচ্ছে হাতুড়ীর শব্দ, কালো ময়লা ধোঁয়ার রাশি সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। বাগ-বাগিচা সব কোথায় শুকিয়ে মরে গেছে। মানুষের মুখ নিরানন্দ, চলন কুৎসিত—পোষাক পরিচ্ছদ তাদের আরও বীভৎস। এ যে অসভ্যের দেশ। পাতাল থেকে যেন ভূত প্রেত দৈত্য দানা সব উঠে এসে দিনের আলো দখল ক'রে বসেছে।

পরীজাদ

বড় দুঃখের কথা, দীনশা। আমাদের তবে

যেতেই হবে। সেইজন্যেই ত আমাদের প্রাণে ডাক এসেছে।

দীনশাহ্

তা মানি। কিন্তু এই কদর্যতাকে চেয়ে ত আমাদের প্রাণ চঞ্চল হয়ে ওঠে নি। আমরা যে চেয়ে ছিলেম ইরাণের মিনার, ইরাণের বাগান।

পরীজাদ

দীনশা, কে জানে, আমাদের ডাক পড়েছে হয়ত পৃথিবীকে আবার আগের মত ক'রে তৈরী করতে, গানে আনন্দে সৌন্দর্য্যে ভ'রে দিতে। নয় কি? আমরা যদি সেখানে যাই, তবে তাকে আমাদের মনের মতনটি ক'রে গড়বই ত।

দীনশাহ্

তুমি ঠিকই বলেছ, পরীজাদ। তোমার কথা

কখন ভুল মিথ্যা হয় না। এস তবে, আমরা রওনা হই।

সমাপ্ত।